ISSN : 3105-4137

মাসিক আত-তাহরীক

আল্লাহ বলেন, ‘তোমরা হীনবল হয়ো না, চিন্তান্বিত হয়ো না। তোমরাই বিজয়ী যদি তোমরা মুমিন হও’ *(আলে ইমরান ৩/১৩৯)*।

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
www.at-tahreek.com
২৮তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০২৫

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, নওদাপাড়া, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية وأدبية

المجلد : ٢٨ العدد : ١٢ ربيع الأول و ربيع الآخر ١٤٤٧هـ/ سبتمبر ٢٠٢٥م

رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب

تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

ছোট্ট সোনামণিদের প্রথম পাঠ বর্ণমালা সিরিজ

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০

মারকাযী জামে মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতার আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন' (বুখারী হা/৪৫০)।

সম্মানিত দ্বীনী ভাই ও বোন! রাজশাহীতে অবস্থিত মারকাযী জামে মসজিদের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ৩য় তলার কাজ শুরু হয়েছে। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতার জন্য দানশীল ভাই-বোনদের প্রতি আমরা বিশেষভাবে আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাঁর গৃহ নির্মাণে সাধ্যমত এগিয়ে আসার তাওফীক দান করুন-আমীন!!

পূর্ণাঙ্গ মসজিদের থ্রিডি ভিউ

নির্মাণাধীন মসজিদ

অর্থ প্রেরণের হিসাব নম্বর

ইসলামিক কমপ্লেক্স মসজিদ ফাণ্ড, হিসাব নং ০০৭১২২০০০০৫৮২, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক রাজশাহী শাখা। বিকাশ (পার্সোনাল) : ০১৭৯৭-৫০৫১৮২, বিকাশ ও নগদ (পেমেন্ট) : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭

সার্বিক যোগাযোগ : ০১৩১৯-৬৭৬৫৬৭, ০১৭৫১-৫১৯৫৬২। নওদাপাড়া (আমচত্বর), রাজশাহী।

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক

আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية دينية و أدبية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

২৮তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

রবীঃ আউঃ-রবীঃ আখের ১৪৪৭ হি.

ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩২ বাং

সেপ্টেম্বর ২০২৫ খৃ.

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক, নওদাপাড়া (আমচত্বর) পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ই-মেইল : tahreek@ymail.com

- সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
- সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
- হা.ফা.বা বই বিক্রয় বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন শিক্ষা বোর্ড : ০১৭৩০-৭৫২০৫০
- হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস : ০১৮৩৫-৪২৩৪১১
- তাওহীদের ডাক : ০১৭৬৬-২০১৩৫৩
- ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০
  (বিকাল ৪.৩০ থেকে ৬.৩০ পর্যন্ত)

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

রাজশাহী অফিস : ০১৭৯৭-৯০০১২৩
ঢাকা অফিস : ০১৭৯৫-৯৪৬৮১৩
ওয়েবসাইট : www.ahlehadeethbd.org

হাদিয়া : ৩০ টাকা মাত্র

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা

	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ		৪৫০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	১০৫০/-	২২৫০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১৩০০/-	২৫০০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৯০০/-	৩১০০/-
আমেরিকা মহাদেশ	২৩০০/-	৩৫০০/-

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয় :**
  - বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের সময় এখনই ০২
- **দরসে হাদীছ :**
  - প্রত্যেকের আমল ও ফিৎরাত অনুযায়ী বিচার হবে ০৩
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- **প্রবন্ধ :**
  - বিবাহ সম্পর্কিত কতিপয় রীতি-নীতি ০৬
    -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক
  - ভুল স্বীকার : সাহস ও সততার অনন্য নিদর্শন ১৩
    -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব
  - ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব ১৮
    -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ
  - ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক* ২৫
- **প্রচ্ছদ রচনা :**
  - শরণার্থীদের জীবন : অবরুদ্ধ মানুষের করুণ আর্তনাদ ২৬
    -আত-তাহরীক ডেস্ক
- **মহিলা অঙ্গন :**
  - ইসলামে নারীর কর্মসংস্থান : একটি পর্যালোচনা ২৮
    -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
- **শিক্ষাঙ্গন :**
  - আরবী ভাষা চর্চা ও পাঠদান *-সারওয়ার মিছবাহ* ৩৩
- **সন্তান পরিচর্যা :**
  - পুত্র সন্তানদের উপদেশ ও শাসনের সঠিক কৌশল : একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ *-জাহিদ হাসান* ৩৮
- **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :**
  - নীল জুতার দো'আ *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* ৩৯
- **স্বাস্থ্যকথা :** ৪০
  - হেপাটাইটিস থেকে বাঁচার উপায়
  - ডায়াবেটিস রোগীর জন্য নিরাপদ ফলমূল
- **কবিতা :** ৪১
  - রবের পথ
  - সৎ সঙ্গ
  - আল্লাহ্‌র নূরে জীবন
  - হায়াত
  - ছালাত
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৪২
- **মুসলিম জাহান** ৪৩
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৩
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৪
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৬
- **বর্ষসূচী** ৫৫

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সেপ্টেম্বর ২০২৫

সম্পাদকীয়

২৮তম বর্ষ ১২তম সংখ্যা

বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের সময় এখনই

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হ'ল মাদ্রাসা শিক্ষা। দ্বীনী জ্ঞান, আখলাক ও সমাজসংস্কারে আমাদের দেশের মাদ্রাসাগুলো যুগ যুগ ধরে অসাধারণ অবদান রেখে আসছে। কিন্তু এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মাদ্রাসাগুলো নীতি, পদ্ধতি, শিক্ষা কারিকুলাম, অবকাঠামোর আধুনিকায়ন এবং উন্নত ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পিছিয়ে আছে। ফলে এদেশের প্রায় ৮০ লক্ষ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষার্থীসহ আলিয়া মাদ্রাসায় পড়ুয়া আরো প্রায় অনুরূপ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেকটাই পিছিয়ে আছে। সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হ'ল, এদেশে ৩০ সহস্রাধিক কওমী মাদ্রাসা থাকলেও এগুলো সরকারীভাবে কোন বিশেষ নিয়ম-নীতি ও জবাবদিহিতার আওতাধীন নয়। এদেশের জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাপনায় তাদের কোন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিও নেই। যদিও ২০১৭ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কওমী মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর 'দাওরায়ে হাদীছ' (তাকমীল)-কে মাস্টার্স ডিগ্রীর সমমান ঘোষণা করেন, যা ২০১৮ সালে আইন পাসের মাধ্যমে আইনী স্বীকৃতি লাভ করে। এই স্বীকৃতির ফলে কওমী শিক্ষার্থীরা ইসলামিক স্টাডিজ এবং আরবী বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রী লাভের একটা সুযোগ পান। তবে নিচের স্তরের মান না দিয়ে সরাসরি সর্বোচ্চ স্তরটির মান দেয়ায় এই সনদ কোন কাজে আসছে না। এ সমস্যা সমাধানে কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা সনদের স্বীকৃতির জন্য 'বাংলাদেশ কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু পরে তা বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কওমী শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চতর ডিগ্রী নিতে পারছে না। এজন্য কওমী মাদ্রাসার নিচের স্তরগুলোর মান নির্ধারণ করাসহ জাতীয় মানে আসার জন্য বিশেষ কিছু আইনী পদক্ষেপ গ্রহণ করা অতীব যরূরী। সম্প্রতি মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকার বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছে, যা খুবই প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে আমাদের যরূরী কিছু পরামর্শ নিম্নরূপ।-

(১) কওমী ধারার বোর্ডগুলিকে ও তার সনদগুলিকে সরকারী স্বীকৃতি দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আলিয়া মাদ্রাসার ন্যায় কওমী মাদ্রাসাগুলির ভৌত কাঠামো উন্নয়নে সরকারকে সাহায্য করতে হবে। পাকিস্তানে পাঁচটি কওমী বোর্ডকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে এবং সরকারী শিক্ষা বোর্ডের সাথে মাদ্রাসার সনদকে ধাপে ধাপে সমন্বয় করা হয়েছে। এবতেদায়ী (প্রাথমিক) থেকে আলিমিয়াহ (মাস্টার্স) পর্যন্ত প্রতিটি স্তরকে সমমান নির্ধারণ করে মাদ্রাসার পাঠ্যক্রমে সরকার নির্দেশিত কিছু বিষয় ইংরেজী, গণিত, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি যুক্ত করা হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণে প্রতিটি বোর্ড স্বতন্ত্রভাবে কাজ করে। ফলে সেখানকার মাদ্রাসার ছাত্ররা সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল, পিএইচডি করার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া সিভিল সার্ভিস, বিদেশে উচ্চ শিক্ষা সবকিছুতেই তারা সুযোগ পাচ্ছে। অনুরূপ রয়েছে ইণ্ডিয়াতেও। যেমন দিল্লী ইউনিভার্সিটি, আলীগড় ইউনিভার্সিটি, এলাহাবাদ ইউনিভার্সিটি প্রভৃতি। যেখানে কওমী মাদ্রাসার সনদসমূহ স্বীকৃত। সুতরাং বাংলাদেশের কওমী মাদ্রাসাগুলোতেও প্রচলিত ২ বছরের ছানাবিয়াকে ইন্টারমিডিয়েট, ৪ বছরের কুল্লিয়াকে বি.এ অনার্স (বাকালুরিউস) এবং ১ বছরের তাখাছ্ছুছ-কে এম.এ (মাজিসতীর) মান দেয়া যেতে পারে। এ ধরনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ নিলে কওমী ধারার শিক্ষার্থীরা শুধু দ্বীনী জ্ঞানার্জনে নয়, রাষ্ট্র ও সমাজের মূলধারাতে সরাসরি সম্পৃক্ত হ'তে পারবে। দক্ষতার পাশাপাশি তাদের সততা ও আমানতদারিতা থেকে উপকৃত হবে সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতিটি সেক্টর।

(২) সরকারী সাহায্যপুষ্ট আলিয়া মাদ্রাসার ভৌত কাঠামোগত উন্নয়ন যথেষ্ট হ'লেও শিক্ষা ব্যবস্থায় এতটাই অচলাবস্থা বিরাজ করছে যে, আদতে সেখানে কোন লেখাপড়া নেই। শিক্ষক-কর্মচারীগণ বড় জোর হাযিরা প্রদানেই সীমাবদ্ধ থাকেন। খাতা-কলমে বহু শিক্ষার্থী দেখানো হ'লেও বাস্তবে তেমন কিছুই নেই। এই অবস্থা দূরীকরণে ছাত্র হাযিরার পার্সেন্টেজ ব্যবস্থা চালু করতে হবে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে। সেই সাথে সহশিক্ষা, বিভিন্ন দিবস পালন, ছবি টাঙানো, শহীদ মিনার স্থাপন, এ্যাসেম্বেলীর নামে জাতীয় পতাকার সম্মানে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাওয়া ইত্যাদি অনৈসলামী প্রথা বন্ধ করতে হবে।

(৩) শিক্ষার মানোন্নয়নে কারিকুলাম সংশোধনের কোন বিকল্প নেই। আলিয়া মাদ্রাসাগুলোতে জেনারেল শিক্ষার বোঝা অত্যধিক। এতে একদিকে ইসলামী জ্ঞান অসম্পূর্ণ থেকে যায়, অন্যদিকে সাধারণ শিক্ষা নিয়েও তারা প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করে আলিয়া মাদ্রাসায় ইসলামী বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেওয়া এবং জেনারেল বিষয়গুলোকে যথাযথ ভারসাম্যের মধ্যে রাখা প্রয়োজন। নতুবা এখান থেকে যারা বের হচ্ছে, তারা অধিকাংশই হচ্ছে না ঘারকা, না ঘাটকা। বর্তমানে প্রায় ৪০% আরবী বিষয় এবং ৬০% জেনারেল বিষয় দিয়ে আলিয়া মাদ্রাসার কারিকুলাম সাজানো আছে। ফলে বিদ্যমান সিলেবাস ও কারিকুলামে আরবী ভাষা ও ইসলামী শিক্ষায় দক্ষতা কাঙ্খিত মানের হয় না। অথচ আরবী ভাষার দক্ষতা অর্জনের উপরেই নির্ভর করে দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করা। এজন্য অন্তত ৭০% ধর্মীয় বিষয় ও ৩০% সাধারণ বিষয় হওয়া আবশ্যক, যার উদ্যোগ ইতিমধ্যেই গ্রহণ করা হয়েছে। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

(৪) ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে বিশুদ্ধ আক্বীদার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনব্যবস্থা। প্রচলিত মাদ্রাসার কারিকুলামে এই দিকটি উপেক্ষা করায় দ্বীন ও সমাজ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক বিভ্রান্তি তৈরি হয়ে আছে। ফলে এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর মধ্যে শিরক-বিদ'আত সম্পর্কে ধারণা খুবই অস্পষ্ট। এ অবস্থার নিরসনকল্পে পাঠ্যপুস্তকসমূহ ছহীহ আক্বীদা ও মানহাজের ভিত্তিতে রচনা করা আবশ্যক।

(৫) সর্বস্তরে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা অপরিহার্য। সেই সাথে শিক্ষকদের আক্বীদা ও আমল-আখলাক যাচাই করা আবশ্যক। সন্তান প্রতিপালনে প্রাথমিক ও সর্বপ্রধান দায়িত্ব অভিভাবকদের। তারা সন্তানকে যে পরিবেশে ও যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাখবেন, সন্তান সেভাবেই গড়ে উঠবে। প্রতিষ্ঠানের ইমারত কথা বলে না। কথা বলেন শিক্ষকগণ। অতএব যোগ্য ও আদর্শ শিক্ষক ব্যতীত আদর্শ শিক্ষার্থী গড়ে উঠতে পারে না।

[বাকী অংশ ৫ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

প্রত্যেকের আমল ও ফিৎরাত অনুযায়ী বিচার হবে

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟ ثُمَّ يَقُولُ: فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

অনুবাদ : হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'এমন কোন আদম সন্তান নেই, যে ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, নাছারা বা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করে। তোমরা তাতে কানকাটা দেখ কি? অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন, 'আল্লাহ্র ফিৎরাত, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না' *(রূম-মাক্কী ৩০/৩০; মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ)*।

উক্ত হাদীছের সারমর্ম হ'ল প্রত্যেক মানবশিশু ইসলাম কবুলের যোগ্যতা নিয়ে জন্ম লাভ করে। অতঃপর পিতা-মাতা তাকে পথভ্রষ্ট করে।

হাদীছের ব্যাখ্যা

مَا مِنْ بَنِى آدَمَ إِلاَّ (مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ) অর্থ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ 'এমন কোন মানব সন্তান নেই, যে ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে না'। অর্থাৎ প্রত্যেক আদম সন্তান ফিৎরাতের উপরে জন্মগ্রহণ করে থাকে। এখানে مَوْلُودٍ 'মুবতাদা' এবং يُولَدُ হ'ল তার 'খবর'। الْفِطْرَةِ অর্থ الاختراع 'প্রথম সৃষ্টি করা'। যেমন মহান আল্লাহ নিজেকে বলেছেন, فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 'আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টিকারী' *(আন'আম-মাক্কী ৬/১৪; ইউসুফ-মাক্কী ১২/১০১)*। এর আরেক অর্থ الحالة والهيئة 'অবস্থা ও প্রকৃতি' *(মির'আত)*। অর্থাৎ মানব প্রকৃতি ও স্বভাবধর্ম। নিঃসন্দেহে যা পশু প্রকৃতি ও পশুর স্বভাবধর্ম হ'তে পৃথক।

তবে প্রথমোক্ত বক্তব্যের প্রতি সূরা রূমের ৩০ আয়াটি সরাসরি ইঙ্গিত দেয়। যেখানে আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূলকে বলেছেন فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيفاً فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا 'তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহ্র 'ফিৎরাত' যার উপরে আল্লাহ মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন' *(রূম ৩০/৩০)*। মোল্লা আলী ক্বারী উক্ত আয়াতের আলোকে 'ফিৎরাত' অর্থ করেছেন 'ঈমান'। অর্থাৎ সেই ঈমান যা সৃষ্টির সূচনায় মানবমণ্ডলীকে উপস্থিত করে আল্লাহ পাক প্রশ্ন করেছিলেন أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই'? তখন সকলেই বলেছিল, হ্যাঁ *(আ'রাফ-মাক্কী ৭/১৭২)*।

তিরমিযীর বর্ণনায় ফিৎরাত-এর স্থলে 'মিল্লাত' শব্দ এসেছে *(হা/২১৩৮)*। আর 'মিল্লাত' অর্থ দ্বীন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ- 'বল, আমার প্রতিপালক আমাকে সরল পথ প্রদর্শন করেছেন। যা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের বিশুদ্ধ ধর্ম এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না' *(আন'আম-মাক্কী ৬/১৬১)*।

অতঃপর ছাহেবে মিরক্বাত হাদীছে বর্ণিত 'ফিৎরাত-এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, 'প্রত্যেক মানব প্রকৃতিতে উক্ত দ্বীন চেনার যোগ্যতা নিহিত রয়েছে (مِنَ الْاسْتِعْدَادِ لِلْمَعْرِفَةِ)। এ থেকে মানুষ বিচ্যুত হ'ত না, যদি না সে অন্যের দ্বারা প্ররোচিত ও প্রতারিত হ'ত'। এজন্যেই মুনাফিকদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, أُوْلَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرُوُاْ الضَّلاَلَةَ بِالْهُدَى 'তারা হেদায়াতের বদলে গুমরাহী খরীদ করেছে। এই ব্যবসায়ে তারা লাভবান হবে না এবং তারা সুপথ প্রাপ্ত হবে না' *(বাক্বারাহ ২/১৬)*। অত্র আয়াতে 'হেদায়াত'কে মূল হিসাবে গণ্য করা হয়েছে- যা মুমিন-মুনাফিক, কাফির-মুশরিক সকলের প্রকৃতিতে নিহিত রয়েছে'। কিন্তু মুমিন ব্যতীত অন্যেরা সেখান থেকে বিচ্যুত হয়ে শয়তানের পথ অবলম্বন করেছে। যেমন ইয়ায বিন হেমার (عياض بن حمار) থেকে মরফূ সূত্রে একটি হাদীছে কুদসীতে বর্ণিত হয়েছে, إِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ 'আমি আমার সকল বান্দাকে একনিষ্ঠ দ্বীনের অনুগামী করে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তানেরা তাদেরকে তাদের দ্বীন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়'। একই হাদীছে অন্য বর্ণনায় حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ 'একনিষ্ঠ মুসলিম রূপে' সৃষ্টি করেছি- কথা এসেছে *(বায়হাক্বী, আল-ক্বাযা ওয়াল ক্বদর হা/৫৮৯)*। অত্র হাদীছে রাবী হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) উক্ত মর্মের পক্ষে বর্ণিত সূরা রূমের ৩০ আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন *(মির'আত)*।

বর্ণিত 'ফিৎরাত' শব্দের অর্থ 'ইসলাম'। তবে ইসলামের দু'টি দিক রয়েছে। একটি হ'ল প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ। যেমন পিতা-মাতার মাধ্যমে মানব সন্তানের জন্মগ্রহণ। অতঃপর কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যে উপনীত হওয়া ও মৃত্যু বরণ করা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, হাসি-কান্না, আনন্দ-বিষাদ ও আশা-নিরাশার মাঝে জীবন কাটানো ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিধানের প্রতি মুমিন-কাফির সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে আত্মসমর্পণ করে থাকে। এদিকে ইঙ্গিত

করেই আল্লাহ পাক বলেন, أَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ– 'তারা কি আল্লাহ্র দ্বীনের পরিবর্তে অন্য দ্বীন তালাশ করছে? অথচ আসমান ও যমীনে যা কিছু রয়েছে, সবই তাঁর আনুগত্য করছে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এবং সকলে তাঁর দিকেই ফিরে যাবে' *(আলে ইমরান-মাদানী ৩/৮৩)*।

দ্বিতীয় দিক হ'ল, শারঈ বিধানের প্রতি আত্মসমর্পণ। মানবজীবনকে সঠিক ও কল্যাণময় পথে পরিচালনার জন্য নবীদের মাধ্যমে যা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে প্রেরিত হয়েছে। এই বিধানের প্রতি যারা আত্মসমর্পণ করেছে, তাদেরকে বলা হয় 'মুসলিম' অর্থাৎ আত্মসমর্পণকারী। আর যারা প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদেরকে বলা হয় 'কাফির' বা প্রত্যাখ্যানকারী। আর যারা প্রকাশ্যে স্বীকার করেছে কিন্তু ভিতরে অস্বীকার করেছে, তারা হ'ল 'মুনাফিক'। যদিও বাহ্যিক আইন অনুযায়ী তারা মুসলিম হিসাবে গণ্য। দ্বিতীয় অর্থে ইসলাম কবুল করা বা না করার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে এখতিয়ার দিয়েছেন স্রেফ তাকে পরীক্ষা করার জন্য। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا 'আমরা মানুষকে সরল পথ প্রদর্শন করেছি। এক্ষণে সে কৃতজ্ঞ হ'তে পারে কিংবা অকৃতজ্ঞ হ'তে পারে' *(দাহ্র-মাক্কী ৭৬/৩)*। আর বিধান জারি হবে তার বয়ঃপ্রাপ্তির পর হ'তে, তার পূর্বে নয়। এমনকি বয়ঃপ্রাপ্তির পরেও সে পাগল, বেহুঁশ, অপ্রকৃতিস্থ বা বাধ্যগত অবস্থায় পতিত হ'লে তার উপরে বিধান মাফ হবে। এক্ষণে মূসা ও খিযিরের কাহিনীতে খিযির কর্তৃক বালক হত্যার ঘটনায় আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) যে বলেছেন, طبعا كافرًا 'প্রকৃতিগতভাবেই সে কাফের' ছিল-এর অর্থ হ'ল, إنه لو عاش يعيد كافرًا 'যদি সে বেঁচে থাকত, তাহ'লে কাফির হ'ত' *(মির'আত)*। এর অর্থ এটা নয় যে, সে এখনই কাফির হয়ে আছে।

এক্ষণে সৃষ্টিগত পর্যায়ে যখন মানুষ বাধ্যগত অবস্থায় থাকে, তখনই সৃষ্টিকর্তা হিসাবে আল্লাহকে চেনা ও তার বিধান মেনে চলার যোগ্যতা আল্লাহ প্রত্যেক মানবসন্তানের প্রকৃতিতে সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর এই যোগ্যতাও এক অর্থে ইসলাম। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى 'পালনকর্তা তিনি, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার যোগ্য আকৃতি দান করেছেন। অতঃপর পথ প্রদর্শন করেছেন' *(ত্বোয়াহা-মাক্কী ২০/৫০)*। আর এই পথপ্রদর্শন বা হেদায়াতের অপর নাম ইসলাম। যা প্রকৃতিগতভাবেই প্রত্যেক মানব সন্তানকে আল্লাহ দান করেছেন। আলোচ্য হাদীছ এবং আয়াতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই ইসলাম আসার পরে তা কবুল না করার কারণে মানুষ দায়ী হবে এবং জাহান্নামী হবে। এই ফিৎরাত ও সত্যকে চেনার যোগ্যতা কেউ পরিবর্তন করতে পারে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ 'আল্লাহ্র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই' *(রূম-মাক্কী ৩০/৩০)*। শয়তানী ধোঁকায় বা পিতা-মাতার কারণে বা শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে মানুষ ইহূদী, নাছারা, মজূসী সবই হ'তে পারে। কিন্তু ইসলামী সত্যকে চেনা ও তা কবুল করার যোগ্যতাকে কেউ পুরাপুরি নিঃশেষ করতে পারে না। আর এজন্যেই তো বিগত যুগে আবু সুফিয়ানকে এবং বর্তমান যুগে মরিস বুকাইলী (১৯২০-১৯৯৮ খৃ.)-কে ইসলাম কবুল করতে দেখা যায়। যারা স্ব স্ব যুগে ছিলেন ইসলামের ঘোর বিরোধী।

উল্লেখ্য যে, অত্র হাদীছে সন্তানের ইহূদী-নাছারা-মজূসী হওয়ার যে কথা এসেছে, এতে ফিৎরাত পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি। বরং বয়ঃপ্রাপ্তির পর তার ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগের স্বাধীনতার কথা বলা হয়েছে। যেখানে ইসলামের শারঈ বিধানগত দিক গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার বান্দাকে দেওয়া হয়েছে তাকে পরীক্ষা করার জন্য।

(فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ) 'অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী-নাছারা বা অগ্নি উপাসক বানায়'। يُهَوِّدَانِهِ অর্থ يجعلانه يهوديا 'বাপ-মা তাকে ইহূদী বানায়'। সাধারণত বাপ-মায়ের কারণেই সন্তানের ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচিতি নির্ধারিত হয়ে থাকে বিধায় এখানে পিতা-মাতাকে খাছ করে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া প্রায় সকল নবীকেই তাঁদের স্ব স্ব উম্মতগণ বাপ-মায়ের ধর্ম ও রীতি-নীতির অনুসরণের দোহাই পেড়েছিল *(বাক্বারাহ-মাদানী ২/৭০; লোকমান-মাক্কী ৩১/২১)* এবং তাওহীদের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছিল। সেকারণেই এখানে পিতা-মাতার উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ বাপ-মা তাদের সন্তানকে জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর থেকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইহূদী, নাছারা বা অগ্নি উপাসক করে গড়ে তোলে। ফলে পরিণত বয়সে সে উক্ত নামেই পরিচিত হয়। আর এটা যে হবে, সেকথা পূর্বেই 'রোযে আযলে' তার তাক্বদীরে লিপিবদ্ধ ছিল। এমন নয় যে, আগেভাগে আল্লাহ এগুলো জানতেন না। অতএব বাপ-মায়ের কারণে সন্তানের ধর্ম পরিবর্তনের মধ্যে ক্বাদারিয়াদের জন্য কোন দলীল নেই।

(كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّوْنَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ) 'যেমন চতুষ্পদ জন্তু পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা প্রসব করে। তোমরা তাতে কানকাটা দেখ কি'? تُحِسُّوْنَ অর্থ تُدْرِكون 'তোমরা দেখকি বা পাওকি'? বাক্যটি রাসূল (ছাঃ) উদাহরণ স্বরূপ পেশ করেছেন শ্রোতাকে ভালভাবে বুঝানোর জন্য। পূর্ণাঙ্গ একটা সুন্দর বাছুরকে চিহ্নিত করার জন্য অনেক সময় মালিক তার কান কেটে বা ছিদ্র করে চিহ্নিত করে। এর দ্বারা চিহ্নিত হয় বটে। কিন্তু সে খুঁৎওয়ালা হয়ে যায়। অমনিভাবে একটা পূর্ণাঙ্গ মানব শিশু বড় হয়ে আমৃত্যু যদি ইসলামের উপরে থাকে, তবে সে থাকে একজন পূর্ণ মানুষ হিসাবে। কিন্তু যদি সে পরবর্তীতে বেঈমান কিংবা ইহূদী-নাছারা ইত্যাদি হয়ে যায়, তবে সে হয় ঐ কানকাটা বাছুরের ন্যায়

খুঁৎওয়ালা পশুর মত। পশু তার এই খুঁতের কারণে কেবল চিহ্নিত হয়। পক্ষান্তরে কাফের-মুশরিক ও ফাসেক হওয়ার কারণে মানুষ কেবল দুনিয়াতেই খুঁৎওয়ালা ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। বরং আখেরাতেও সে জাহান্নামী হয়।

(ثُم يقول : فطرة الله– الاية) ‘অতঃপর তিনি পাঠ করেন কুরআনের আয়াত...)। এখানে ‘তিনি পাঠ করেন’ অর্থ রাবী হযরত আবু হুরায়রা পাঠ করেন। অর্থাৎ তিনি রাসূলের উপরোক্ত হাদীছের পক্ষে দলীল হিসাবে সূরা রূমের ৩০ আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।

ভূপৃষ্ঠে এমন কোন স্থান থাকবে না যেখানে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছবে না *(আহমাদ হা/২৩৮৬৫, মিশকাত হা/৪২)*। এরপরও কারু নিকটে যদি ইসলামের দাওয়াত না পৌঁছে, তবে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তাদের আনুগত্যের পরীক্ষা নিবেন। এতেই তারা জান্নাতী বা জাহান্নামী হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের দিন চার ব্যক্তি ঝগড়া করবে। বধির, বোকা, অতিবৃদ্ধ এবং যে ইসলামের দাওয়াত পায়নি এমন ব্যক্তি। বধির বলবে, হে আমার প্রতিপালক! ইসলাম এসেছে অথচ আমি কিছুই শুনতে পাইনি। বোকা বলবে, ইসলাম আগমন করেছে। অথচ শিশুরা আমার দিকে পশুর বিষ্ঠা নিক্ষেপ করেছে। অতিবৃদ্ধ বলবে, ইসলাম আগমন করেছে। অথচ আমি কিছুই বুঝতে সক্ষম হইনি। আর ইসলামের দাওয়াত না পাওয়া ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ! তোমার কোন দাওয়াতদাতা আমার নিকটে আসেনি। অতঃপর আল্লাহ তাদের নিকট হ’তে আনুগত্যের শপথ নিবেন। এরপর তাদের নিকট একজন দূত প্রেরণ করবেন এই মর্মে যে, তোমরা আগুনে প্রবেশ কর। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যার হাতে আমার প্রাণ, তার কসম করে বলছি, যে ব্যক্তি তাতে প্রবেশ করবে, আগুন তার উপর ঠাণ্ডা ও শান্তি দায়ক হয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি প্রবেশ করবে না, তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(ছহীহাহ হা/১৪৩৪)*।

অতএব আমাদেরকে নিরন্তর দাওয়াত চালিয়ে যেতে হবে। অতঃপর প্রত্যেকের আমল ও ফিৎরাত অনুযায়ী আল্লাহ বিচার করবেন।

দেশের যেকোন প্রান্ত থেকে পাইকারী ও খুচরা ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৫১-১০৩৯০৪

Bangla Food BD

আস্থা রাখুন শতভাগ খাঁটি পণ্য পাবেন ইনশাআল্লাহ।

আমাদের পণ্য সমূহ

- আম *(মৌসুমি)*
- লিচু *(মৌসুমি)*
- সকল প্রকার খেজুর
- মরিচের গুঁড়া
- হলুদের গুঁড়া
- আখের গুড় (মৌসুমি)
- খেজুরের গুড় (মৌসুমি)
- খাঁটি মধু
- খাঁটি গাওয়া ঘি
- খাঁটি নারিকেল তৈল *(এক্সট্রা ভার্জিন)*
- খাঁটি সরিষার তৈল
- খাঁটি জয়তুনের তৈল
- খাঁটি নারিকেল তৈল
- খাঁটি কালো জিরার তৈল
- নাটোরের কাঁচাগোল্লা ও বগুড়ার দই

যোগাযোগ

facebook.com/banglafoodbd
E-mail : abirrahmanarif@gmail.com
Whatsapp & Imo : 01751-103904
www.banglafoodbd.com

SCAN ME

আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : **মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল মান্নান** (এম.এম, এম.এ)।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায় :

স্মার্ট ট্যুরস এ্যান্ড ট্রাভেলস

সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং ৫২৫।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতি মাসে ওমরাহ গ্রুপ চলমান। ১,৩০,০০০-১,৪০,০০০ টাকার মধ্যে উন্নতমানের খাবার ও আবাসন সহ ছহীহ সুন্নাহ পদ্ধতিতে ওমরাহ পালনের সুযোগ রয়েছে।

সাতক্ষীরা অফিস : কামালনগর ঈদগাহ সংলগ্ন, সাতক্ষীরা

মোবাইল : ০১৭১১-৩৬৫৩৩৭, ০১৯৭৮-১০৭৮০৫

(সম্পাদকীয় বাকী অংশ)

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সংস্কার মানে মূল কাঠামো ধ্বংস করা নয়, বরং যুগোপযোগী করা। এজন্য মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের মৌলিক জ্ঞানে পারদর্শী হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে তথ্যপ্রযুক্তি, ভাষা, গবেষণা ও সমসাময়িক বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ করে দিতে হবে। এতে একজন মাদ্রাসা শিক্ষার্থী বহুমুখী জ্ঞানে পারদর্শী হয়ে উঠবে। সেই সাথে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনায় একজন দক্ষ নাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে বলব, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের যে সুযোগ এসেছে, তা দ্রুত গ্রহণ করা এবং এগিয়ে নেয়ার সময় এখনই। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলগণ এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এবং যতদ্রুত সম্ভব উপরোক্ত পরামর্শগুলো বিবেচনা করে কর্মপরিকল্পনা সাজালে মাদ্রাসা শিক্ষার সুদিন আবার ফিরে আসবে ইনশাআল্লাহ। সঠিক ইসলামী জ্ঞান ও আদর্শচর্চার সুযোগ পেলে মানুষ তাদের সন্তানদেরকে মাদ্রাসামুখী করার জন্য সচেষ্ট হবেন এবং মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে তাদের মধ্যে যে নেতিবাচক ধারণাগুলো রয়েছে, তাও দূরীভূত হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন।- আমীন! *(স.স.)*।

বিবাহ সম্পর্কিত কতিপয় রীতি-নীতি

-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

ভূমিকা : ইসলামে বিবাহ শুধুমাত্র একটি সামাজিক চুক্তি নয়, বরং এটি একটি পবিত্র ইবাদত এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গুরুত্বপূর্ণ একটি সুন্নাহ। এটিকে ঈমানের অর্ধেক হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষের মানসিক প্রশান্তি, চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা এবং বংশ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিবাহের মতো সুন্দর একটি বিধান দান করেছেন। ইসলামী জীবনদর্শনে বিবাহের প্রতিটি রীতি-নীতি কুরআন ও হাদীছের আলোকে পরিচালিত, যা সকল প্রকার বাহুল্য, অপচয় ও কুপ্রথা থেকে মুক্ত। কিন্তু কালের বিবর্তনে মুসলিম সমাজেও বিভিন্ন অনৈসলামিক ও স্থানীয় সংস্কৃতি থেকে উদ্ভূত রীতিনীতি প্রবেশ করেছে, যা প্রায়শই বিবাহের ইসলামী সৌন্দর্য ও সরলতাকে ম্লান করে দেয়। বিবাহে নানা অসঙ্গতির মধ্যে রয়েছে নিকাহনামায় ওলীকে বাদ দেয়া, তথাকথিত উকিল নিয়োগ দেয়া, হুযুর ছাড়া বিবাহের কথা না ভাবা, ঈজাব-কবুলের ভাষার ভুল-ভ্রান্তি, নিকাহনামার বিভিন্ন ধারার অসঙ্গতি ইত্যাদি বিষয়। এই প্রবন্ধে ইসলামী শরী'আত নির্ধারিত বিবাহের মূল স্তম্ভ, শর্তাবলী এবং রীতি-নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল। সাথে সাথে বিবাহকে কেন্দ্র করে প্রচলিত বিভিন্ন অসঙ্গতি ও শরী'আতবিরোধী কার্যকলাপ তুলে ধরা হ'ল।-

নীতি ও রীতির পার্থক্য : নীতি ও রীতি বহুল প্রচলিত ও জানা শব্দ হ'লেও এদের অর্থে কিছু পার্থক্য আছে। নীতি অনেকটা আইনের সঙ্গে জড়িত। যার ভিত্তিতে কোন কাজ করা হয়। ভালো-মন্দ, সঠিক-বেঠিক, শুদ্ধ-অশুদ্ধ নির্ণয়ের মাপকাঠি হ'ল নীতি। যে কোন দেশের সরকার, সংস্থা, সংঘ, কমিটি ইত্যাদি পরিচালনার যে বিধিবদ্ধ কিংবা অবিধিবদ্ধ নিয়ম থাকে তাই নীতি নামে পরিচিত। প্রত্যেক দ্বীন-ধর্মের বিশেষত ইসলামেরও রয়েছে বিধিবদ্ধ বা লিখিত নিয়ম-কানূন, যার ব্যত্যয় কখনই কাম্য নয়। নীতি কখনো আইনের রূপ নেয়, যা লঙ্ঘনে শাস্তির মুখোমুখি হ'তে হয়। নীতির আরবী কানূন, হুকুম এবং ইংরেজী Policy, Principle, Ethics ইত্যাদি।

রীতি হ'ল কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সমাজের প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতি। প্রথা থেকেও আইন প্রণয়ন করা হয়। তখন তা নীতিতে পরিণত হয়। বিবাহ পৃথিবীর সকল দেশে সকল সমাজে ও সকল ধর্মে নারী-পুরুষের শারীরিক সম্পর্কের একটি স্বীকৃত প্রথা বা রীতি। জাহেলী যুগেও আরবে এ রীতি ছিল। তবে তার পদ্ধতি ছিল একাধিক। তন্মধ্যে ইসলাম যে পদ্ধতিকে স্বীকৃতি দিয়েছে তাই ইসলামে বিবাহের নীতি। তালাকেরও ইসলামে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। রীতির আরবী তায়ামুলুন্নাস, রসম, রেওয়াজ ইত্যাদি এবং ইংরেজী Custom, Tradition, Method, style ইত্যাদি।

রীতি বা প্রথা গড়ে ওঠার পিছনে কোন একক ব্যক্তি বা সংস্থার ভূমিকা থাকে না। কিন্তু নীতি নির্ধারণকারী কোন ব্যক্তি বা সংস্থা নীতি নির্ধারণ করে থাকে। নীতি নির্ধারক নীতির পরিবর্তন না ঘটানো পর্যন্ত তার ধরন সর্বত্র একই রকম থাকে। যেমন মুসলিমদের বিবাহের ধরন ও নীতি সারা বিশ্বে একই রকম। কিন্তু রীতি স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বদলায়। যেমন বিবাহের সাথে বর-কনে দেখার আনুষ্ঠানিকতা, বরযাত্রী গমন, ফিরানি-ঘুরানি ইত্যাদি সব দেশে সকল সমাজে এক নয়। রীতি কালে কালে গড়ে ওঠে, একক কেউ এর পিছনে দায়ী নয়।

জীবন চলার পথে নীতিকে মূল গণ্য করা হয়। নীতির সাথে রীতি যতটুকু খাপ খায় বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় ততটুকু রীতি মানতে কারও কোন আপত্তি নেই। নীতি লঙ্ঘন করে রীতি মানার কোন সুযোগ নেই। ইসলামের নীতি লঙ্ঘনকারী ইসলামের কাছে দোষী হবে। কিন্তু রীতি যেহেতু স্থানীয় সমাজের বিষয় তাই রীতি লঙ্ঘনে ব্যক্তি সমাজে নিন্দার পাত্র হয় এবং সমাজ নিজের মতো করে তার বিরুদ্ধে শালিস দরবার করে।

বিবাহের পরিচয় : বিয়ে, শাদী, নিকাহ, দাম্পত্য সম্পর্ক, পানি গ্রহণ, দার গ্রহণ, পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া, এমন কত মিষ্টি মধুর ও হৃদয়গ্রাহী নাম জড়িয়ে আছে বিবাহের সাথে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবাহ একটি দ্বীনী চুক্তি। এই চুক্তির মাধ্যমে এক জোড়া নারী-পুরুষের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক বৈধ হয় এবং পারস্পরিক পারিবারিক দায়িত্ব গড়ে ওঠে। পৃথিবীতে ভবিষ্যৎ মানব প্রজন্মের আগমনের ধারা রক্ষা বিবাহের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

সাধারণত অভিভাবকদের সম্মতি ও চেষ্টায় যে বিবাহ হয় তাকে আয়োজিত বিবাহ বলে। সমাজে এরূপ বিবাহের প্রচলনই অধিক। আয়োজিত বিবাহে সচরাচর ঘটা করে বিবাহের ব্যবস্থা হয়ে থাকে। সেখানে ওলী, সাক্ষী, বিবাহ পড়ানোর জন্য মাওলানা, কাযী, উপস্থিত দর্শকশ্রোতা ইত্যাদি থাকে। বর কনের উপস্থিত তো বলাই বাহুল্য।

আর ছেলে-মেয়ে নিজেদের পসন্দ ও ইচ্ছায় যে বিবাহ করে তাকে ভালোবাসার বা গোপন বন্ধুত্বজনিত সম্পর্কমূলক বিবাহ বলে। ভালোবাসার বা গোপন বন্ধুত্বজনিত সম্পর্কমূলক বিবাহে সাধারণত ছেলে-মেয়ে কাযী অফিসে গিয়ে ঈজাব-কবুলের মাধ্যমে কাবিননামা রেজিস্ট্রি করে বিবাহ করে থাকে। এ বিবাহে কোন ঘটা বা আয়োজন থাকে না, বরং সময়বিশেষে সাক্ষীসাবুদ জোটানই মুশকিল হয়ে পড়ে। সাধারণত এক্ষেত্রে কনের ওলীও উপস্থিত থাকে না। কনে নিজ উদ্যোগে বিয়ে করে থাকে। এরূপ বিবাহ শরী'আতসিদ্ধ নয়। উল্লেখ্য, মাহরাম নয় এমন নারী ও পুরুষের মাঝে বিবাহ বহির্ভূত ভালোবাসা বা গোপন বন্ধুত্বজনিত সম্পর্ক গড়ে তোলা হারাম ও নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 'আর (তোমাদের জন্য হারাম হ'ল)

সকল সধবা নারী। তবে তোমাদের মালিকানাধীন ক্রীতদাসী (ও যুদ্ধবন্দিনী) ব্যতীত। এটি তোমাদের জন্য আল্লাহ বিধিবদ্ধ করেছেন। এদের ব্যতীত তোমাদের জন্য সকল নারী হালাল করা হয়েছে এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে সম্পদের বিনিময়ে কামনা করবে বিবাহের উদ্দেশ্যে, ব্যভিচারের উদ্দেশ্যে নয়' *(নিসা ৪/২৪)*। পরের আয়াতে স্বাধীন মহিলাকে বিবাহের সামর্থ্য না জুটলে তিনি দাসীদের বিবাহ করতে বলছেন, فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ 'অতএব তোমরা তাদের পরিবারের অনুমতিক্রমে তাদের বিয়ে কর এবং তাদেরকে সঙ্গতভাবে মোহরানা প্রদান কর এজন্য যে, তারা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং ব্যভিচারিণী হবে না বা কাউকে উপপতি হিসাবে গ্রহণ করবে না' *(নিসা ৪/২৪)*। কাজেই অবৈধ সম্পর্ক করা থেকে প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর সাবধান ও হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

বিবাহে ওলীর আবশ্যকতা : বিবাহে ওলীর ভূমিকা নীতি ও রীতি উভয়ভাবে স্বীকৃত। ওলী বলা হয় আছাবাকে। মীরাছ বা মৃতের সম্পত্তি লাভের ক্রমানুসারে পুরুষ ওয়ারিছগণ ওলী হবে। কনের পূর্ব স্বামীর গর্ভজাত পুত্র যদি থাকে তবে সেই তার মায়ের বিবাহের ওলী হবে। এমনিতে পিতা, ভাই, দাদা, চাচা ক্রমান্বয়ে কনের ওলী হবে। বাংলায় ওলী অর্থ অভিভাবক। উক্ত সূত্রে ওলী কনে পক্ষেরও থাকতে পারে আবার বর পক্ষেরও থাকতে পারে। কারও এরূপ ওলী না থাকলে রাষ্ট্রপ্রধান তার ওলী হবেন। বিবাহে কনের ওলীকে কনের অনুমতি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আছে, আবার কনেরও ওলীর সম্মতিক্রমে বিবাহ করার বিধান রয়েছে সেহেতু বিবাহে কনের ওলীর ভূমিকা কুরআন ও হাদীছে নীতিগতভাবে স্বীকৃত। অবীরা মহিলাদের বিয়ে দেওয়ার জন্য পুরুষদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেছেন, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ 'তোমাদের মধ্যস্থিত স্বামীহীনা অবীরাদের তোমরা বিবাহ দিয়ে দাও' *(নূর ২৪/৩২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 'ওলি ছাড়া কোন বিবাহ হয় না'।[১] মেয়েরা বিবাহের উপযুক্ত হ'লে ওলীরাই তো চেষ্টা করে ছেলে যোগাড় করে এবং তাদের বিবাহ দেয়। তাদের এ চেষ্টা পাত্র খোঁজা থেকে শুরু করে বিবাহ হওয়া এবং কন্যা বিদায় করা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। বিয়ের আকদ বা ঈজাব ও কবুলে তাই তাদের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

কিন্তু রীতিগতভাবে 'ওলী' শব্দটি কানে এলেই বাঙালী মুসলিম আল্লাহ্‌র ওলীদের বুঝে থাকে। যারা ছিলেন ছূফী-সাধক, যাদের ছিল অনেক অলৌকিক ক্ষমতা বা কারামত। কিন্তু বিবাহের ওলীর সাথে এ সকল ওলীর কোন যোগ নেই। আসলে আমাদের জানার পরিধি এতই কম যে, অনেক কন্যার পিতা ও ভাই জানে না যে, বিবাহে তারা তাদের মেয়ে বা বোনের ওলী এবং বিবাহের ঈজাব-কবুলের দায় তাদের। বিবাহের ঈজাব-কবুলের ভাষা ও বাক্য তাদের ভালোমতো জানা দূরের কথা, মোটের উপর তা জানার বিষয় বলেও তারা মনে করে না। নিজেকেসহ যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই আমার কথার সত্যতা জানা যাবে। সমাজের লোকেরা মনে করে, এটা জানবে বিবাহ পড়ানো মাওলানা ও কাযী। তারা কথা বলবে বিবাহের জন্য উদ্দিষ্ট উকীলকে। উকীলও নিজে বিবাহের ঈজাব-কবুলের ভাষা ও বাক্য জানবে না; মাওলানা বা কাযী তাকে যা বলতে বলবে সে তা মুখে উচ্চারণ করবে। তার উচ্চারণ শেষ হ'লে ঐ মাওলানা বা কাযী বরকে বলবে, 'আপনি বলুন, কবুল'। তখন বর বলবে, কবুল। বর কবুল শব্দ জানলেও কোন মুহূর্তে তা বলতে হবে তা জানে না। মাওলানা বা কাযী তাকে বলার পর সে মুখ খোলে। মোটকথা, বিবাহে আমাদের সমাজে ওলী খুবই গৌণ ভূমিকা পালন করে। যেভাবে তার দায়িত্ব পালন করার কথা সেভাবে সে করে না। হয় ইচ্ছে করে, নয় জানার অভাবে।

বিবাহে উকীল ও সাক্ষী নিয়োগ : বিবাহে ওলী যদি নিজে ভূমিকা রাখতে পারে তবে নীতিগতভাবে উকীল নিয়োগের কোন প্রয়োজন নেই। বিবাহের আকদ বা চুক্তির অনুষ্ঠানে মূল কাজ ঈজাব ও কবুল। ঈজাব ও কবুলের নির্দিষ্ট ভাষা আছে। তা যদি কোন ওলী ও বর-কনে না জানে, কিংবা জানলেও পরিস্থিতি বিবেচনায় তারা নিজেরা ঈজাব-কবুল করতে অনিচ্ছুক হয় তবেই উকীল নিয়োগের কথা আসবে। সে ক্ষেত্রে ওলী নিজ উদ্যোগে কিংবা অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে একজন দক্ষ লোককে উকীল নিয়োগ দেবে। তার নিয়োগকৃত উকীলকে অবশ্যই ঈজাব ও কবুল বাস্তবায়নের যোগ্যতা থাকতে হবে। সে বিবাহের খুৎবা দেওয়ারও যোগ্যতা রাখবে। ঈজাব ও কবুলের ভাষা তার পূর্ব থেকে জানা থাকবে। মাওলানা বা কাযী তাকে বলার পর সে বলবে না। মূলত উকীল অর্থ প্রতিনিধি বা এজেন্ট। সে বিবাহে ওলীর পক্ষে ঈজাব ও কবুলের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব করবে। সে যদি ওলীর প্রতিনিধিত্বই করতে না পারে তবে সে কিসের উকীল? যে উকীল জজের সামনে মক্কেলের কথা উপস্থাপন করতে পারে না তাকে মক্কেল কি উকীল নিয়োগ দেয়? তাই যে উকীল ঈজাব কবুলের ভাষা নিজের থেকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে না তার উকীল হওয়া বিধিসম্মত নয়। এটি ওলীর পক্ষ থেকে তার উপর অর্পিত আমানত। বিবাহে খুৎবা দেওয়া মুস্তাহাব। উকীল বাদে অন্য কেউ দিলেও অসুবিধা নেই। বিবাহের মজলিসে হাযির সবাই বিবাহে সাক্ষী বলে গণ্য। তবে ফেতনা-ফাসাদ এড়াতে দু'চারজনের নাম উল্লেখে নীতিগতভাবে অসুবিধা নেই।

সাক্ষীদের উকীলের মুখের ঈজাব এবং বরের মুখের কবুল স্বকর্ণে শুনতে হবে অথবা লিখতে দেখতে হবে। কনের সম্মতি কেবল ওলী নেবে। এই অনুমতির জন্য সাক্ষী রাখার কোন প্রয়োজন নেই এবং বিয়ের কোন পক্ষের সাক্ষীদেরই কনের থেকে অনুমতি গ্রহণের শব্দ শোনা শর্ত নয়। আমাদের

১. *আবু দাউদ হা/২০৮৫; তিরমিযী হা/১১০১; ছহীহুল জামে' হা/৭৫৫৫।*

সমাজে বিবাহের অনুষ্ঠানে ওলী নয় বরং উকীলকেই রীতিগতভাবে মূল বা প্রধান হিসাবে ভাবা হয়। উকীল ছাড়া বিবাহ আমরা ভাবতেই পারি না। সম্ভবত এ কারণে নিকাহনামায় ওলীর বদলে উকীলকে স্থান দেওয়া হয়েছে। কনের পিতা কিংবা ভাই বেঁচে আছে, বিবাহের মজলিসেও উপস্থিত আছে তবুও উকীল নিয়োগ করতেই হবে। এটাই এ দেশের প্রথা। দেখা যায় বিবাহের মজলিসে বর পক্ষ আসার পর শুরু হয় উকীল সাক্ষী নির্বাচন। অনেক ক্ষেত্রে উকীল সাক্ষী নিয়োগের সময় বাপ-ভাইয়ের হদিসই থাকে না। সমাজের মোড়ল-মাতব্বররাই তাদের ঠিক করে। অথচ উকীল নিয়োগ দেওয়ার কথা ওলীর। রীতি যাই থাকুক, ওলীর সম্মতি ছাড়া উকীল নিয়োগ নীতিগতভাবে শুদ্ধ নয়। তারা বিবাহে বর পক্ষের দু'জন ও কনে পক্ষের দু'জন সাক্ষীকে যরূরী মনে করে। হাজেরানে মজলিস সবাই যে সাক্ষী হ'তে পারে তা তারা হয়তো জানে না। আবার কনের সম্মতির শব্দ সাক্ষীদের শোনাকে তারা রীতি হিসাবে যরূরী মনে করে।

ঈজাব-কবুলের ভাষা : ঈজাব ও কবুল দু'টি আরবী শব্দ, যার বাংলা অর্থ প্রস্তাব ও গ্রহণ। বিবাহে বর ও কনে নামের দু'টি পক্ষ থাকে। তাদের যে পক্ষ বিবাহের চুক্তির কথা প্রথমে বলেন, তাকে বলা হয় ঈজাব এবং দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তির উক্ত কথায় যে সম্মতি জ্ঞাপন করে তাকে বলা হয় কবুল। এ দু'টি বিষয় বিবাহের রোকন বা স্তম্ভ। মূলত এ দু'টির মাধ্যমে বিবাহ চুক্তি সম্পন্ন হয়। কাজেই ঈজাব ও কবুলের ভাষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখানে যে ভাষা নীতিগতভাবে অনুমোদিত তার মধ্যে থাকা কর্তব্য। তার ব্যত্যয় কোনভাবেই কাম্য নয়।

ঈজাব ও কবুলের বাক্য ওলী এবং ওলীর পক্ষে উকীলও বলতে পারেন। সেখানেও উভয় পক্ষের বাক্যের ক্রিয়া অতীতকাল বাচক কিংবা ঈজাব আদেশবাচক এবং কবুলের বাক্য অতীতকালবাচক হবে। যেমন কনের ওলী বরকে বলবে, আমার মেয়ে অমুককে এত টাকা অথবা সোনা ইত্যাদি মোহরের বিনিময়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ও নিকাহনামায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষী মেনে আপনার সাথে বিবাহ দিলাম'; উত্তরে বর বলবে, 'আমি এ বিবাহ কবুল করলাম'। কনের উকীল বিবাহের ঈজাব করলে বলবে, আমার মক্কেল অমুকের অমুক নামের মেয়েকে আমি উকীল হিসাবে এত টাকা অথবা সোনা ইত্যাদি মোহরের বিনিময়ে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ ও নিকাহনামায় উল্লিখিত ব্যক্তিদের সাক্ষী মেনে আপনার সাথে বিবাহ দিলাম'; উত্তরে বর বলবে, 'আমি কবুল করলাম'।

অন্যূন দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষীর সামনে ওলীর সম্মতিতে তারা এভাবে বললে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। ঈজাব-কবুলের আগে একটি খুৎবা আরবীতে দেওয়া মুস্তাহাব। ঈজাব-কবুল কনের ওখানে হোক কিংবা বরের ওখানে হোক, এক জায়গায় একবারই বলতে হবে। তিনবার বলা আবশ্যক নয়।

ঈজাব-কবুলের বাক্য নীতিগতভাবে যাই থাক আমাদের সমাজে প্রচলিত রীতি তার ধারেকাছেও নেই। তাদের ভাষা না অতীতকালবাচক, না আদেশবাচক। তারা সাধারণত মেয়ের কাছে প্রথমে একবার ঈজাব-কবুল করে, পরে ছেলের কাছে দ্বিতীয়বার ঈজাব-কবুল করে। উভয় জায়গায় ঈজাব-কবুলের বাক্য তিনবার উচ্চারণ করা হয়। এর কম হ'লে তাদের দৃষ্টিতে বিবাহ হয় কিনা সন্দেহ। তাদের উকীল সাক্ষীদের দলবল সাথে করে মেয়ের নিকট যায়। সেখানে মেয়ে পক্ষের অনেক মহিলা উপস্থিত থাকে। তারা মেয়েকে সাহস যোগায় এবং তার মুখ দিয়ে শুধু 'কবুল' শব্দ উচ্চারণের অনুরোধ জানাতে থাকে। উকীল ছাহেব মাওলানার শেখানো ভাষা কনের সামনে আওড়ায়। সে বলে, অমুক গ্রাম অথবা শহর নিবাসী অমুকের ছেলে অমুক এত টাকা দেনমহর এওয়াজে যার এত টাকা নগদ, এত টাকা বাকি অথবা পুরোটাই বাকিতে আপনাকে বিবাহের প্রস্তাব করছে। আপনি এ শর্তে রাজি থাকলে বলুন কবুল। মেয়ে বলে 'কবুল'। তখন উকীল আগত সাক্ষীদের বলে, আপনারা শুনেছেন তো? তারা বলে, হ্যাঁ। আর যদি না শুনে থাকে তবে বলে, না। তখন সে কনেকে জোরে কবুল বলতে বলে। এভাবে তিনবার সে উক্ত কথা বলে এবং সাক্ষীরা শুনেছে কি-না তা জানতে চায়। সাক্ষীদের পরিচয় কিন্তু সে কনের কাছে তুলে ধরে না। অবশ্য নীতিগতভাবে তার কোন প্রয়োজনও নেই। কেননা এ অনুমতি নেওয়ার দায়িত্ব মেয়ের ওলীর এবং একমাত্র মেয়ের ওলীর। এখান থেকে সাক্ষীদের দলবলসহ উকীল ছাহেব বরের মজলিসে এসে সালাম দিয়ে বলে, হ্যাঁ, মেয়ে কবুল বলেছে। তখন মাওলানা বা অন্য কেউ সাক্ষীদের জিজ্ঞেস করে, মেয়ে কবুল বলেছে কি-না? তারা বলে, হ্যাঁ। আসলেও তারা মেয়ের থেকে কবুল না বলিয়ে আসে না।

এবার মাওলানা ছাহেব উকীলকে বলতে বলেন, অমুক গ্রাম অথবা শহর নিবাসী অমুক তার মেয়ে অমুককে এত টাকা দেনমহর এওয়াজে যার এত টাকা নগদ, এত টাকা বাকি অথবা পুরোটাই বাকিতে আপনার সাথে বিবাহ দিতে রাযী বা সম্মত। আপনি এ শর্তে রাযী থাকলে বলুন কবুল। ছেলে বলে 'কবুল'। তখন উকীল আগত সাক্ষীদের বলে, আপনারা শুনেছেন তো? তারা বলে, হ্যাঁ। এখানেও মাওলানার মাধ্যমে উকীল একই কথা তিনবার বলে। তারপর মাওলানা বসে বসে আরবীতে একটি খুৎবা পড়েন। তারপর সমবেত কণ্ঠে দরূদ ও দো'আ-মুনাজাতের মাধ্যমে বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেন। সবশেষে বরকে বলা হয়, দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম দাও। সে দাঁড়িয়ে সালাম দেয়। এ সময় বর পক্ষের আনা মিষ্টি-খেজুর ইত্যাদি বিতরণ করা হয়। এভাবে সম্পাদিত বিবাহ য পদ্ধতিগতভাবে সঠিক নয়।

ঈজাব-কবুলের সাথে মোহরের উল্লেখ শর্ত নয়। মোহর উল্লেখ ছাড়াই বিবাহ বৈধ হয়ে যায়। তবে সে ক্ষেত্রে মোহরে মিছাল বা মেয়ের বংশে তার সদৃশ একজন মেয়ের যে মোহর সেই পরিমাণ মোহর সে স্বামীর থেকে পাবে।

বিবাহে মাওলানার ভূমিকা : সাধারণত মসজিদের ইমাম বিবাহ পড়ানোর দায়িত্ব পালন করেন। তাকে প্রচলিত কথায় মাওলানা বলে। নীতিগতভাবে বিবাহে মাওলানার কোনই ভূমিকা নেই। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বাহের কোন স্থানেই বিবাহে মাওলানার আবশ্যকতা উল্লেখ করা হয়নি। তবে বিবাহে খুৎবা পড়া মুস্তাহাব। খুৎবা পড়া হয় আরবীতে। আমরা বাঙালিরা সচরাচর আরবী জানি না। তাই আরবী জানা লোক হিসাবে খুৎবা দেওয়ার জন্য নীতিগতভাবে একজন মাওলানা থাকতে পারেন। কিন্তু আমাদের সমাজে মাওলানা থাকার কারণ অন্যত্র। এখানে বিবাহ পড়ান বলে একটা কথা আছে। এই বিবাহ পড়িয়ে থাকেন মাওলানা। তিনিই পুরো অনুষ্ঠান শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পরিচালনা করেন। উকীল-সাক্ষীর নিয়োগ কার্যকর করা, আনুষ্ঠানিকতার শুরুতে উকীল কনের কাছে গিয়ে কী বলবে তা শিখিয়ে দেওয়া, বরের কাছে এসে উকীল কী বলবে তা বলে দেওয়া এবং শেষে খুৎবা দিয়ে দো'আ-দরূদের মাধ্যমে বিবাহের শেষ নামানো পর্যন্ত মাওলানা কাজ করে থাকেন। এর নাম বিবাহ পড়ানো। কাজেই রীতি অনুসারে মাওলানা ছাড়া বিবাহের কথা ভাবা যায় না। কাবিননামা লেখার কাযীও যেহেতু মাদ্রাসা পড়ুয়া তাই তারাও অনেক সময় মাওলানার কাজ করেন। খুৎবা যে ঈজাব-কবুলের আগে দিতে হয় তা মনে হয় আমাদের জানা নেই, অথবা সমাজের রসম হিসাবে আমরা পরে দিতে অভ্যস্ত।

ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ও নিকাহনামা : যিনি বিবাহের তথ্য নিকাহনামায় লিপিবদ্ধ করেন তাকে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বা বিবাহ নিবন্ধক বলে। আর যে ফরমে তিনি বিবাহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাকে নিকাহনামা বলে। কিন্তু প্রচলিত ভাষায় নিবন্ধককে কাযী এবং তার লেখা ফরমকে কাবিননামা বলা হয়। বাংলাদেশে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুযায়ী ১৯৬১ সাল থেকে নিকাহনামার প্রচলন হয়েছে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে প্রতি ইউপিতে এবং শহরাঞ্চলে প্রতি ওয়ার্ডে একজন করে মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্ট্রার বা কাযী নিযুক্ত আছেন। তাদের মূল কাজ বিবাহের মজলিসে উপস্থিত থেকে নিকাহনামা লিপিবদ্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর গ্রহণ করা। পরে সীল-স্বাক্ষরসহ নিকাহনামার কপি মেয়ে অথবা ছেলের অভিভাবককে প্রদান করা।

নিকাহনামা একটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। বিবাহ নিয়ে উদ্ভূত মামলা-মোকদ্দমা নিরসন এবং দেশে-বিদেশে স্বামী-স্ত্রী প্রমাণে নিকাহনামার গুরুত্ব অপরিসীম। এটি একটি লিখিত দলীল বিধায় স্বামী স্ত্রীর যে কোন জনের মৃত্যুতে অন্যজন এটি দেখিয়ে মীরাছ দাবী করতে পারে। সন্তানের পিতৃত্ব মাতৃত্ব প্রমাণেও নিকাহনামার ভূমিকা স্বীকৃত।

কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত নিকাহনামায় বেশ কিছু অসঙ্গতি রয়েছে। যেমন ১. পুরো নিকাহনামায় ওলীর কোন উল্লেখ নেই। অথচ শরী'আতে কনের ওলীর সম্মতি ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়। তাই এ নিকাহনামায় ৪নং ধারার পরে অথবা সুবিধাজনক যে কোন জায়গায় কনের ওলী বা অভিভাবকের নাম ও ঠিকানা সংযোজন অত্যন্ত যরূরী। ২. নিকাহনামায় দৃষ্টিকটূভাবে উকীলের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং সেই উকীল কন্যা কর্তৃক নিয়োগের কথা বলা আছে। যদিও বিবাহের মজলিসে কোন কনে নিজ উদ্যোগে তার বিবাহের উকীল নিয়োগ দিয়েছে বলে জানা যায় না। আর কনে যদি নিজে উকীল নিয়োগ দিয়েই থাকে তবে তার ওখানে পুনরায় ঈজাব-কবুলের মানে কী?

হানাফী মাযহাব মতে যদিও কনে স্বেচ্ছায় ওলীর অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারে কিন্তু সে বিবাহ ওলীর অনুমোদনের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং কনে নয় বরং কনের ওলী প্রয়োজনবোধে উকীল নিয়োগ দেবে। ওলী ছাড়া বিয়ে শুদ্ধই হয় না। তাই এ নিকাহনামার ৭নং ধারায় এরূপ সংশোধনী কাম্য। উল্লেখ্য, বর বিবাহের মজলিসে স্বয়ং উপস্থিত থাকলে তার উকীল নিয়োগ আবশ্যক নয়। বর উকীল নিয়োগ না দিলে তার উকীল ও সাক্ষী নিয়োগের অনুচ্ছেদ অবশ্যই ফাঁকা থাকবে। সেখানে ম্যারেজ রেজিস্ট্রার কোন নাম-ঠিকানা নিজ থেকে লিখলে তা আমানতের খিয়ানত হবে। অনেকে বিবাহের সাক্ষীদের নাম-ঠিকানা বরের সাক্ষীর ঘরে লিখে দেয়। নিকাহনামার ১১নং ধারায় বিবাহের সাক্ষীদের নাম ঠিকানার জন্য দু'জন সাক্ষীর ক্রমিক উল্লেখ রয়েছে। সাক্ষী দু'জন পুরুষ হ'লে তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু শরী'আত তো বিবাহে দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা সাক্ষীর অনুমোদন দিয়েছে। কাজেই কোন বিবাহে মহিলাদের সাক্ষী মানলে তৃতীয় ক্রমিকের আবশ্যক হবে, যার সুযোগ নিকাহনামায় নেই। সরকার নারী দরদী নারী বান্ধব বলে কথার খৈ ফুটালেও বিবাহের সাক্ষীতে নারীদের সুযোগের বেলায় বলতে গেলে উদাসীন। নারীরাও হয়তো তাদের জন্য শরী'আত প্রদত্ত এ সুযোগের কথা জানে না।

নিকাহ নামায় ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ ও ২০নং ধারায় মোহর এর স্থলে দেনমোহরের উল্লেখ আছে। আমাদের প্রশ্ন 'দেনমোহর' শব্দের ব্যবহার নিয়ে। এটা কি শারঈ কোন পরিভাষা, নাকি নিকাহনামা প্রস্তুতকারকদের মনোক্তি? আরবী মাহর বা মাহরুন শব্দকে বাংলায় মোহর উচ্চারণ করা হয়, যার অর্থ বিয়েতে কনেকে প্রদত্ত হাদিয়া। ঘোড়া, গাধার প্রথম বাচ্চাকে আরবীতে মোহর বলে। কুরআনে মোহর-এর স্থলে 'আজর', 'উজুর' 'ছদুক্বাত' শব্দ এসেছে। হাদীছে 'মাহর' ও 'ছদাক বা ছিদাক' বর্ণিত হয়েছে। ফিক্বাহ শাস্ত্রে 'মাহর' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। মাহরকে মোহর উচ্চারণে কিছু যায় আসে না। কিন্তু মোহরের আগে 'দেন' এল কোত্থেকে তা রীতিমতো গবেষণার বিষয়। আমার যতদূর মনে হয় আরবী 'দাইনুন' বা দাইন শব্দ থেকে 'দেন' শব্দ এসেছে। দাইন অর্থ ঋণ, কর্য, দেনা। এই দাইন অপভ্রংশ বা বিকৃত উচ্চারণে 'দেন' হয়ে মোহরের আগে যুক্ত হয়েছে। কেন যুক্ত হ'ল তার কারণ হিসাবে বলা যায়, বিবাহে মোহর বাকি থাকাই এদেশে রেওয়াজ। বাকিও আরবী দাইন বা দেনার সমার্থক শব্দ।

যেহেতু মোহর পরিশোধের বাধ্যবাধকতা এ সমাজের মানুষ মনে করে না তাই তারা মোহরের আগে 'দেন' শব্দ যোগ করে 'দেনমোহর' বানিয়ে নিয়েছে; যাতে মোহর বাকী রাখা যায়। যে করেই হোক, মোহরের আগে যে শব্দ কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বহে নেই সেই শব্দ একটি রাষ্ট্রীয় ফরমে কী করে যোগ হ'ল? এটা কি আমাদের দ্বীন ও আরবী ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচয় বহন করে না? আমি বিশ্বাস করি, দেশে যথেষ্ট জ্ঞানী-গুণী মানুষ আছেন। তারা আমার কথা সঠিক কি-না তা যাচাই করে 'দেন' শব্দ বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নিবেন। যারা বিবাহের মজলিসে মোহর পরিশোধ করেন তাদের তো আর মোহর বাকী থাকে না। অথচ ছাপানো ফরমে দেনমোহর লেখা থাকার কারণে নগদে পরিশোধের পরও তাদের মোহর ফরমের দৃষ্টিতে বাকী থেকে যায়। তাই ভুলভাল ফরম থেকে শুদ্ধ ফরম নিশ্চয়ই কাম্য। উল্লেখ্য, মোহর না দেওয়ার ইচ্ছায় বিবাহ করলে হাদীছে তা মারাত্মক গুনাহের কারণ বলা হয়েছে। কাজেই বরকে বিবাহের সময় অথবা পরবর্তীতে অবশ্যই মোহর পরিশোধ করতে হবে।

নিকাহনামার ১৮ ও ১৯নং ধারায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে কি-না এবং তাতে স্বামীর তালাক প্রদানের ক্ষমতা খর্ব হয়েছে কি-না তার উল্লেখ আছে। এ দু'টি ধারায় বিশেষত ১৮নং ধারায় প্রয়োজনে স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তালাকের অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোন সে তালাক, স্ত্রী তা কীভাবে প্রয়োগ করবে, তাতে স্বামীর তালাক প্রদানের ক্ষমতা কিভাবে খর্ব হয়নি তার কোন ব্যাখ্যা নেই। হয়তো মূল আইনে তা আছে। কিন্তু বিয়ের মজলিসে কোন ম্যারেজ রেজিস্ট্রারকে এ দু'টি ধারার ব্যাখ্যা করতে কোনদিন শুনিনি। সবার মুখে মুখে চালু আছে, ঐ ধারায় স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু কি সে তালাক, কত তালাক, স্ত্রী স্বামীকে তালাক দেবে, নাকি স্ত্রী নিজের উপর নিজে তালাক দেবে, তার কোন কথা সেখানে নেই। স্ত্রী জানে না সে ঐ ধারা অনুসারে কত তালাকের মালিক হয়েছে, আবার স্বামীও জানে না সে কত তালাকের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু দেখা যায় নিকাহনামা অনুসারে স্ত্রী যখন তালাক কার্যকর করে তখন তিন তালাকই কার্যকর করে। স্ত্রী তিন তালাক দিয়ে দাম্পত্য জীবনের ইতি ঘটাল অথচ স্বামীর তালাকের অধিকার খর্ব হ'ল না, এর থেকে পাগলামি আর কিছু আছে কি? যদি স্বামীর অর্পিত ক্ষমতা যে কোন সময় প্রত্যাহারের অধিকার থাকত কিংবা এক অথবা দুই তালাকের অধিকার দেওয়া হ'ত তাহ'লেও স্বামীর তালাকের ক্ষমতা খর্ব হয়নি বলে কিছুটা দাবী করা যেত। কিন্তু তালাকের নাটাই স্ত্রীর হাতে দিয়ে স্বামীর অধিকার খর্ব হয়নি বলা প্রহসন বৈ কিছু নয়।

সবচেয়ে বড় কথা, ইসলাম এক সাথে তিন তালাক দেওয়ার কথা বলে না। বিবাহ বিচ্ছেদের জন্য তিন তোহরে তিন তালাক দিতে হয়। কাজেই স্বামীর তালাকের ক্ষমতা যাতে পুরো মাত্রায় খর্ব না হয় সেজন্য 'তাফবীয' তালাকের একটা সীমা নিকাহনামায় উল্লেখ থাকা উচিত। আর তা কোনক্রমেই এক থেকে দুইয়ের অধিক হবে না। তাতে স্ত্রী তালাক নিলেও পরবর্তীতে সমঝোতার দ্বার খোলা থাকবে এবং উভয় পক্ষ চাইলে অন্যত্র বিবাহের ঝুঁকি ছাড়াই পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। আবার তাতে খোলার অনুমতিও পরিষ্কার করে লিখে রাখা যায়। স্ত্রী খোলার আবেদন করলে স্বামী তা দিতে সম্মত থাকবে -মর্মে লেখা থাকলে স্ত্রী স্বামীকে জানিয়ে খোলা করতে পারবে। তাতে পরবর্তীতে নতুন করে বিবাহ করা যায়।

২৩নং ধারায় যে ব্যক্তির দ্বারা বিবাহ পড়ানো হয়েছে তার নাম, পিতার নাম ইত্যাদি চাওয়া হয়েছে। বিবাহে বর, কনে, ওলী, সাক্ষী ও উকীল (যদি নিয়োগ দেওয়া হয়ে থাকে) এই পাঁচ প্রকার লোকের প্রয়োজন শরী'আতে উল্লেখ আছে। কে বিবাহ পড়াল তা উল্লেখ থাকার প্রয়োজন নেই। অথচ নিকাহনামায় ওলীর মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে অস্বীকার করে অপ্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে উল্লেখ করে প্রয়োজনীয় করে তোলা হয়েছে। এতে দেশের অধিকাংশ মুসলিম নারী-পুরুষ নিজেরা বিবাহের ভাষা জানে না, বিবাহের আক্বদ ও চুক্তি করতে কী করতে হয় বা বলতে হয় তা জানে না। সব জানেন ঐ বিবাহ পড়ানো ব্যক্তি। তিনি যা বলতে বলবেন তাই বলবে উকীল, তাই বলবে কনে, তাই বলবে বর। বিবাহের অনুষ্ঠানের আগ-পর, সংসার জীবন ইত্যাদি সবকিছুই তারা জানে, সবকিছুই করতে পারে; জানে না ও পারে না শুধু বিবাহের চুক্তি করতে। কারণ সেজন্য সমাজে 'বিবাহ পড়ানো ব্যক্তি' নামের নির্দিষ্ট লোক আছে। কবি ফররুখ আহমদের ছড়ার একটি পংক্তি আছে, 'কালো ঘোড়া এলো যেই খোঁড়া হ'ল সকলেই'।

বিবাহে কনের অনুমতি গ্রহণ : বিবাহে কনের অনুমতি গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। অনুমতি গ্রহণ করবেন ওলী অথবা তার নিযুক্ত প্রতিনিধি। প্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে কুমারী হোক কিংবা অকুমারী, তার অনুমতি গ্রহণ ছাড়া ওলী তাকে বিবাহ দিলে সে বিবাহ মেয়ের উপর নির্ভর করবে। সে বিবাহ প্রত্যাখ্যান না করলে বিবাহ বলবৎ থাকবে, আর প্রত্যাখ্যান করলে বিবাহ ভেঙ্গে যাবে। কাজেই অনুমতি নিয়ে তবেই ওলী তার বিবাহের আয়োজন করবে।

প্রশ্ন হচ্ছে- অনুমতি গ্রহণের সময়টা কখন? বিবাহের সমস্ত আয়োজন শেষ করে ঈজাব-কবুলের সময়? নাকি আলোচ্য বরের সাথে বিবাহের আলোচনার শুরুতে? অনুমতি গ্রহণের নিয়মটাই বা কি? এ সকল কথা আগে জানতে হবে। ধার্মিকতা, তাক্বওয়া, আদব-আখলাক বা আচার-ব্যবহার, শিক্ষাগত যোগ্যতা, আর্থিক অবস্থা, ভাই-বোনের সংখ্যা, দেহ সৌষ্ঠব, বয়স, বংশ মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়ে মেয়ের সঙ্গে ছেলের কুফূ বা সামঞ্জস্য আছে কি-না সেসব কথা জানিয়ে তার মতামত নেওয়ার নাম অনুমতি বা এযেন। এ অনুমতি নিশ্চয়ই বিবাহের সূচনা লগ্নে নেওয়া সমীচীন। আগে অনুমতি নেওয়া হ'ল না, বিবাহের সব আয়োজন করে আকদের মজলিসে অনুমতি নেওয়ার সময় মেয়ে অস্বীকার করলে তখন

কি সকলের মাথায় বাড়ি পড়বে না? এমন পরিস্থিতিতে পিতা-মাতার সব আয়োজন পণ্ড হবে। বর পক্ষসহ উপস্থিত আত্মীয়-বন্ধু, প্রতিবেশীরা অপমানিত হবেন। যা কেউ সহজে মেনে নেবে না। কাজেই নিয়মতান্ত্রিক অনুমতি আগেই নিতে হবে।

ছেলে দেখা : অনানুষ্ঠানিকভাবে ছেলেকে মেয়ের অভিভাবক অবশ্যই দেখবে। সম্ভব হ'লে মেয়েও ছেলেকে দেখবে। তার ও ছেলের মধ্যে বিবাহ করার মতো কোন আকর্ষণীয় গুণের দেখা মিলতে পারে। অভিভাবককে তো তার মেয়ের স্বার্থেই ছেলেকে দেখতে হবে, জানতে হবে এবং সেখানে মেয়ে বিবাহ দেওয়া যাবে কি-না তার তত্ত্ব তালাশ করতে হবে। তবে প্রাধান্য দিতে হবে দ্বীনদারীকে। হাদীছে এসেছে, إِذَا خَطَبَ إِلَيْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ 'যখন তোমাদের নিকট এমন কেউ মেয়ের বিবাহের পয়গাম দেবে যাদের দ্বীনদারী ও চরিত্রে তোমরা সন্তুষ্ট তাদের সাথে তোমরা বিবাহ দাও। নচেৎ ধরা বক্ষে ফেতনা ও বড় অশান্তি দেখা দেবে'।[২] সব রকম খোঁজ-খবর নিলেই না তিনি মেয়ের সাথে আলোচনা করে তার মতামত ও অনুমতি নিতে পারবেন। ছেলেকেও আনুষ্ঠানিকভাবে দেখায় মেয়ের মতো সমস্যা রয়েছে। উভয় পক্ষ বিবাহে সম্মত হ'লে বিবাহের দিন-ক্ষণ ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি আলোচনার জন্য তারা আনুষ্ঠানিকভাবে একত্রিত হ'তে পারে।

কনে দেখা : যে মেয়ের সাথে বিবাহের কথা হচ্ছে নীতিগত ভাবে হাদীছে তাকে দেখার কথা বলা হয়েছে। জাবির বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ، فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ، قَالَ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا وَتَزَوُّجِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا- 'যখন তোমাদের কেউ কোন মহিলাকে বিবাহের পয়গাম দেয় তখন তার মধ্যে বিবাহ করার মতো আকর্ষণীয় কোন দিক দেখা সম্ভব হ'লে সে যেন তা দেখে নেয়। তিনি বলেন, আমি এক তরুণীকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সেজন্য আমি তাকে দেখার সুযোগ খুঁজছিলাম। এক পর্যায়ে আমি তাকে দেখতে পাই এবং তার মাঝে আকর্ষণীয় এমন কিছু পাই, যা তাকে বিবাহ করতে আমায় উদ্বুদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত আমি তাকে বিবাহ করি'।[৩]

কনে দেখার জন্য আনুষ্ঠানিকতা যরূরী নয়। বাড়িতে, হোটেল-রেস্টুরেন্টে, পথ চলতে বা যে কোন স্থানে দেখার পর্ব সারা যাবে। ছেলে ও মেয়ের নির্জনে মিলিত হওয়া ব্যতিরেকে উভয় পক্ষের সম্মতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কনের পিতা, মাতা কিংবা ভাইয়ের উপস্থিতিতে কনেকে দেখাও জায়েয। কিন্তু আনুষ্ঠানিকতার সাথে এমন অনেক রীতি জড়িয়ে গেছে যা নীতিগতভাবে মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়। সেগুলো বাদ দিলে এভাবে দেখাতে দোষ হবে না। কনে দেখার মূল উদ্দেশ্য বিবাহ করা। হয়তো ছেলে মেয়ের মধ্যে এমন কোন আকর্ষণীয় গুণ দেখতে পাবে যা তাকে বিবাহে উদ্বুদ্ধ করবে। আবার অপসন্দের বিষয় দেখে পিছিয়েও আসতে পারে। মেয়ের দেখবে শুধু চেহারা, দু'হাতের তালুর উপর নীচ এবং দু'পা। মেয়েকে ছেলে নিজে দেখতে পারে, আবার চাইলে নিজের মা, বোন, আত্মীয়া অথবা নির্ভরযোগ্য কোন মহিলা দেখে তার গুণাবলী তাকে জানাতে পারে। এভাবে সে রাযী কি-না প্রকাশ করতে পারে।

তবে দিনক্ষণ ঠিক করে আনুষ্ঠানিক রীতিতে মেয়ে দেখায় অনেক সমস্যা আছে। এখানে ছেলের সাথে এমন অনেক পুরুষ লোক মেয়েকে দেখতে যায় যা বৈধ নয়। অপরদিকে বিবাহের আশায় কনে পক্ষ আগত লোকদের যথাসাধ্য ব্যয়বহুল মেহমানদারী করতে বাধ্য হন। আনুষ্ঠানিকতার ফলে বিষয়টি আশে পাশে জানাজানি হয়ে যায়। ফলে বিবাহ না হ'লে মেয়েকে এবং তার পরিবারকে খুবই বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হ'তে হয়। কোন মুসলিমকে কষ্ট না দিয়ে ও বিব্রত না করে নীতিগতভাবে দেখলে কোনই অসুবিধা নেই। সুতরাং অনানুষ্ঠানিকভাবে দেখাই শ্রেয়।

এনগেজমেন্ট ও আংটি পরানো : এনগেজমেন্ট ও আংটি পরানো একটি দেশীয় রীতি। বিবাহে উভয় পক্ষের সম্মতি ও অঙ্গীকারের নাম এনগেজমেন্ট। তার স্মারক হিসাবে আংটি পরানোর রেওয়াজ রয়েছে। এটি শারঈ কোন নীতিমালাভুক্ত বিষয় নয়। সামনে বিবাহের শুভেচ্ছা স্মারক হিসাবে সাধারণত বর ও কনেকে এটি দেওয়া হয়। আগের যুগে এটি ছিল না। ইদানীং চালু হয়েছে। তবে কোন কারণে বিবাহ না হ'লে আংটি ইত্যাদি ফেরৎ দিতে হবে। উল্লেখ্য, পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম। সেকারণ বরকে স্বর্ণের আংটি দেওয়া যাবে না।

বরযাত্রী : বিবাহে বরযাত্রী আবহমানকাল থেকে চলে আসা একটি সামাজিক রীতি। কনে পক্ষের অভিভাবকগণও এ সামাজিক রীতিতে অভ্যস্ত। তারা তাই দরকষাকষি করে একটা সংখ্যায় সম্মত হয়। কনে পাত্রস্থ করার তাকীদে এবং সামাজিক রেওয়াজের বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো মানসিক হিম্মত ও সাহস না থাকায় তারা বরযাত্রীদের মেনে নেয়। আবার ছেলের সাথে আপনজন, আত্মীয়, প্রতিবেশী, ছেলের বন্ধুবান্ধব প্রমুখকে বিবাহের বরযাত্রী না করলে বর পক্ষেরও পারিবারিক ও সামাজিক অশান্তি সৃষ্টি হয়। ফলে তারাও বাধ্য হয়ে নানাজনকে বরযাত্রী করে। আর এভাবে বরযাত্রীর বহর লম্বা হয়ে যায়। তারপরও অনেকে দাওয়াত না পেয়ে নাখোশ হন। তবে বরের সাথে বিবাহে কেউই যাবে না ইসলাম সে কথাও বলে না। ইসলাম ঘোষণা দিয়ে বিবাহ করতে বলে। দু'দশ জন ন্যূনপক্ষে যা না হ'লেই না, কেবল তারা যাবে।

---

২. *তিরমিযী হা/১০৮৪; ইবনু মাজাহ হা/১৯৬৭; ছহীহাহ হা/১০২২; ইরওয়া হা/১৮৬৮।*

৩. *আবুদাঊদ হা/২০৮২।*

সংখ্যাটা কনে পক্ষকে জানিয়ে তাদের সম্মতি নিতে হবে। যদি কনে পক্ষ আমভাবে সকলকে আপ্যায়ন করতে চায় তাহ'লে অবশ্য সংখ্যা জানানোর প্রয়োজন নেই। কিন্তু উভয় পক্ষ একটি সংখ্যায় সম্মত হ'লে সেই সংখ্যাই যেতে হবে। বেশী হ'লে কনে পক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

একবার এক ছাহাবী রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সহ পাঁচ জনকে দাওয়াত করেন। পরে একজন ছাহাবী আসেন এবং তাঁর সাথে যান। মেযবানের বাড়ি গিয়ে তিনি আগে অতিরিক্ত আগন্তুকের কথা জানান এবং বলেন, এ আমাদের অনুগামী হয়েছে। তুমি চাইলে তাকে অনুমতি দিতে পার, আর না চাইলে তাকে বাদ দিতে পার, সে ফিরে যাবে। তিনি অবশ্য তাকে অনুমতি দিয়েছিলেন।[৪] বিনা দাওয়াতে খাওয়া ভদ্রতার পরিপন্থী। আরবরা এ ধরনের লোককে 'তুফায়লী' বলে। বাংলায় 'রবাহূত' ও 'অনাহূত'।

শরী'আতের নীতি হ'ল কারও সম্মতি নিয়ে মেহমান হওয়া। আর মেযবান যার বা যাদের আতিথ্য দিতে সম্মত হবে তাদের সাধ্যমতো সম্মানজনক আতিথ্য দেওয়া। হাদীছে এসেছে, যে আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাস করে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। ব্যবসায়ের নিয়মে পারস্পরিক সম্মতিতে একে অপরের সম্পদ খেতে আল্লাহ তা'আলা আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিবাহে বরযাত্রীদের নিতে না চাইলে কনে পক্ষকে বরযাত্রীর জন্য চাপাচাপি করা উচিত হবে না। সমাজে বহু মানুষের বরযাত্রীর খরচ নির্বাহের সামর্থ্য নেই। একজনের ব্যতিক্রমী আচরণ অন্যদের উপর প্রভাব ফেলে। এতে সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে। এজন্য কাউকে অনুমতি দেওয়া ঠিক নয়। ইসলামের সহজ বিবাহ পদ্ধতি আজ বরযাত্রী, যৌতুক, ব্যবহার্য দ্রব্য প্রদান, ভোজ উৎসব, উপহার বিনিময় ইত্যাদি নানা কারণে কঠিন ও ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে।

বিবাহের দিনের আয়োজন : বিবাহে বাড়তি মুবাহ আনন্দ নীতিগতভাবে সিদ্ধ। মেয়ে পক্ষের কিছু লোক ছেলের বাড়িতে এবং ছেলে পক্ষের কিছু লোক মেয়ের বাড়িতে যাওয়া, আত্মীয়তা-মেহমানদারী করা নিয়ে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। এগুলো ছিলায়ে রাহেমি বা আত্মীয়তার বিধানভুক্ত। কিন্তু আমাদের দেশে কেউ কেউ বিবাহ উপলক্ষ্যে বাড়াবাড়ি করে থাকে। বাড়ি কিংবা কমিউনিটি সেন্টার, যেখানেই বিবাহের আয়োজন করা হোক সেখানে পর্দা রক্ষার্থে ছেলে ও মেয়েদের আলাদা বসার ব্যবস্থা করা কর্তব্য। বিবাহে আলোকসজ্জা বর্তমানে ফ্যাশনে পরিণত হয়েছে। এটি অপচয়। এসব পরিহার করতে হবে। অপচয় কবীরা গুনাহ এবং শয়তানী কাজ। পুরো অনুষ্ঠানে বরং এটি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়। মহিলা মহলে বিবাহে যে সাজ-গোজের প্রদর্শনী চলে তাতে পর্দার খেলাফ হরহামেশাই হয়। নীতির বরখেলাফ করে রীতি পালন কোনভাবেই কাম্য নয়। ধনী-গরীব সকল শ্রেণীর লোককে দাওয়াত দেওয়া ও আপ্যায়ন করা শারঈ নিরীখে কর্তব্য। যে যিয়াফত-মেযবানিতে শুধু ধনীদের ডাকা হয়, গরীবদের দাওয়াত দেওয়া হয় না তা বরকতশূন্য।

বিবাহের আকদ বা অনুষ্ঠান : বিবাহে আক্দ বা চুক্তিই মুখ্য। কাজেই বিবাহের অনুষ্ঠান যেন কোনক্রমেই গৌণ হয়ে না পড়ে সেদিকটা উভয় পক্ষকে নিশ্চিত করতে হবে। বর পক্ষ আসার পর সৌজন্য হিসাবেই নাশতা-পানি দিতে হয়। নাশতা শেষে ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে উপস্থিত সবাই মিলে সুন্দরভাবে বিবাহের আক্দ সম্পন্ন করবে। শারঈ বিধিবিধান যা বর্ণিত হয়েছে তা মানায় যাতে কোন ত্রুটি না হয় সেটা খেয়াল রাখতে হবে। যেহেতু সরকারি আইন অনুসারে নিকাহনামা বা কাবিননামা লেখার বিধান রয়েছে সেহেতু স্থানীয় কাযীকে সময়মতো উপস্থিত থাকতে বলতে হবে। বর পক্ষ হাযির হওয়ার পর তাদের সাথে ওলী, উকীল, সাক্ষী ও মোহর সম্পর্কে আলোচনা করবে। সামাজিক রীতি অনুসারে বর পক্ষের দেয় বৈধ আনুষঙ্গিক খরচ যদি কিছু থাকে সেটাও স্থির করবে, যাতে পরে এ নিয়ে দু'পক্ষের মতান্তর থেকে মনান্তর না ঘটে। এরপর বিবাহের মূল পর্ব তথা ঈজাব-কবুলের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রথমে বিয়ের খুৎবা পড়তে হবে। ওলী, উকীল, বর, মাওলানা, কাযী যে-ই চান খুৎবা পড়তে পারবেন। খুৎবা শেষ হ'লে দু'পক্ষ পূর্বে ঈজাব-কবুলের যে নীতি বর্ণিত হয়েছে তার কোন একটির মাধ্যমে ঈজাব কবুল করে বিবাহ সম্পন্ন করবেন।

অতঃপর কাযী নিকাহনামার পূরণীয় সকল অংশ বর্ণিত নিয়মে যথাসাধ্য পূরণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন। সরকারি ফরম তিনি তো আর নিজের ইচ্ছামতো সংযোজন-বিয়োজন করতে পারবেন না। তবে ১৮ ধারায় তিনি অবশ্যই দু'পক্ষকে জানিয়ে 'তাফবীয' তালাক অথবা 'খোলা' তালাকের কথা এবং এক তালাকের সংখ্যা স্পষ্ট করে লিখবেন। সাধারণভাবে তালাকের ক্ষমতা দিয়েছে কিংবা হাঁ দিয়েছে জাতীয় অস্পষ্ট ভাষা লিখবেন না।

[ক্রমশঃ]

আত-তাহরীক টিভির সাথে থাকুন ঘরে বসে বিশুদ্ধ দ্বীন শিখুন!
আত-তাহরীক টিভি
অহির আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের জন্য
অনলাইন ভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আত-তাহরীক টিভি' পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক দ্বীনি অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে যাচ্ছে। সম্পূর্ণ বিজ্ঞাপন মুক্ত ও বিষয়ভিত্তিক আলোচনা সমূহ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন।
ওয়েবসাইট :
www.hadeethfoundationbd.com
www.ahlehadeethbd.org
www.tawheederdak.com
www.at-tahreek.com
মোবাইল এ্যাপ পেতে স্ক্যান করুন
মোবাইল নম্বর : ০১৪০৪-৫৩৬৭৫৪
ফেসবুক পেইজ
At-Tahreek Tv
Monthly At-Tahreek
ইউটিউব চ্যানেল
At-Tahreek Tv
Ahlehadeeth Andolon Bangladesh

৪. *বুখারী হা/৫৪৩৪, ২০৮১; মিশকাত হা/৩২১৯।*

ভুল স্বীকার : সাহস ও সততার অনন্য নিদর্শন

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব

মানবজীবনে ভুল এক অনিবার্য বাস্তবতা। জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে, ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় আমরা হরহামেশাই ভুল করে থাকি। কিন্তু সেই ভুলকে আঁকড়ে ধরে অহংকার ও আত্মম্ভরিতার পথে চলা যেমন ধ্বংসের নামান্তর, তেমনি নিজের ভুল অকপটে স্বীকার করে অনুতপ্ত হওয়া এক মহৎ গুণ এবং মহান আল্লাহ্র নিকটে অত্যন্ত পসন্দনীয় একটি আমল। যে ব্যক্তি নিজের ভুল স্বীকার করার মতো সৎ সাহস রাখে, সে কেবল নৈতিকভাবেই শক্তিশালী নয়, বরং সে আল্লাহ্র ক্ষমা ও করুণা লাভের পথেও এক ধাপ এগিয়ে যায়। আর ভুল স্বীকার করা মানুষের দুর্বলতা নয়। কারণ সৃষ্টিগতভাবেই ভুল করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে রয়েছে। তাই ভুল হ'লে স্বীকার করে নেওয়াই যৌক্তিক এবং উত্তম বান্দার বৈশিষ্ট্য।

কিছু ভুল বা অন্যায় মানুষের হক বা অধিকার নষ্ট করে। যেমন কাউকে অপমান করা, মন্দ আচরণ করা, প্রতারণা করা, মিথ্যার আশ্রয় নেয়া, কারো অর্থ বা জমি আত্মসাৎ করা ইত্যাদি। এসব ভুল বান্দার সাথে সংশ্লিষ্ট, যা আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা চেয়ে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বরং এক্ষেত্রে বান্দার কাছেই ভুল স্বীকার করে ক্ষমা চাইতে হয়।[১]

ভুল স্বীকারের উপকারিতা :

ভুল স্বীকারের গুরুত্ব বর্ণনা করে রাসূল (ছাঃ) বলেন, كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ– 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর সর্বোত্তম ভুলকারী তারাই, যারা তওবা করে' (অর্থাৎ ভুল স্বীকার করে তা থেকে ফিরে আসে)।[২]

হাদীছটি আমাদের শিক্ষা দেয়, মানুষ হিসাবে আমরা কেউ ভুলে উর্ধ্বে নই। জীবনে চলার পথে ভুল-ত্রুটি হবেই। এটি মানুষের জন্মগত স্বভাবের অংশ। তাই ভুলের জন্য অনুশোচনা করা, লজ্জিত হওয়া এবং ভবিষ্যতে সেই ভুল থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করাই একজন মুমিনের মৌলিক কর্তব্য।

ক্ষমা লাভ : ভুল স্বীকার করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উপকার হ'ল, এর মাধ্যমে রাব্বুল আলামীনের ক্ষমা পাওয়া সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, وَآخَرُوْنَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 'কিছু লোক রয়েছে, যারা তাদের অপরাধ সমূহ স্বীকার করেছে। তারা তাদের কর্মে ভাল ও মন্দ মিশ্রিত করেছে। অবশ্যই আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(তওবা ৯/১০২)*।

মর্যাদা বৃদ্ধি : ভুল স্বীকার করা মানুষের বিনয়-নম্রতার অন্যতম লক্ষণ। যখন কেউ অন্যের কাছে কোন ভুলের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে, তখন সে ছোট হয়ে যায় না, বরং তার সম্মান ও মর্যাদা বহুগুণে বেড়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য বিনয়ী হয়, আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন'।[৩]

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, إِذا أَرَادَ اللهُ بِعَبْد خيرا جعله معترفا بِذَنبِهِ ممسكا عَن ذَنْب غَيره جوادا بِمَا عِنْده زاهدا فِيمَا عِنْده مُحْتَملا لأَذى غَيره وَإِن أَرَادَ بِهِ شرا عكس ذَلِك عَلَيْهِ 'আল্লাহ যখন কোন বান্দার জন্য কল্যাণ চান, তখন তাকে স্বীয় পাপ স্বীকারের যোগ্যতা এবং অন্যের পাপ অন্বেষণ করা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করেন। আর সে স্বীয় সম্পদ নিয়েই প্রাচুর্য বোধ করে ও অন্যের সম্পদ থেকে বিমুখ থাকে এবং অন্যের দুঃখ-কষ্টের ভার বহন করে। আর যখন কারো অকল্যাণ চান, তখন বিপরীতটাই ঘটে'।[৪]

মিথ্যা অহমিকা থেকে মুক্তি : ভুল স্বীকার না করা এবং ভুলের পক্ষে সাফাই গাওয়া মূলত অহংকারের লক্ষণ। ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে যা নিতান্তই মূল্যহীন। আর অহংকারকারীকে আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন না। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ 'যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৫]

পাপমুক্তি : ভুল স্বীকারের মানসিকতা ব্যক্তিকে তওবার প্রতি অগ্রগামী রাখে। কেননা প্রতিনিয়ত সে ভাবে যে, আমার ভুল হ'তে পারে। ফলে সে বেশী বেশী ইস্তেগফার করে। নিজের ভুলগুলো খুঁজে ফিরে। কারো হক নষ্ট হ'ল কিনা, কাউকে অপমান করা হ'ল কিনা প্রভৃতি ব্যাপারে সর্বদা সতর্ক থাকে। ফলে পাপ থেকে মুক্ত থাকা তার জন্য সহজ হয়ে যায়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ 'যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে তওবা করে, সে এমন ব্যক্তি যেন তার কোন গোনাহই ছিল না'।[৬]

সৌভাগ্যবানদের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ তাওফীক : মানুষ হিসাবে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভুল করা আমাদের স্বভাবজাত। কিন্তু সেই ভুলকে শনাক্ত করে, বিনয়ের সাথে তা স্বীকার করার ক্ষমতা সবার থাকে না। এটি কোন সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়, বরং এটি একটি গভীর আধ্যাত্মিক গুণ। যখন আল্লাহ কাউকে ভালোবাসেন, তখন তিনি তাকে নিজের

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ওপর যুলুম করেছে সে যেন তার কাছ থেকে ক্ষমা নিয়ে নেয়। তার ভাইয়ের পক্ষে তার নিকট হ'তে পুণ্য কেটে নেয়ার আগেই। কারণ সেখানে কোন দীনার বা দিরহাম নেই। তার কাছে যদি পুণ্য না থাকে তবে তার (মাযলূমের) গোনাহ এনে তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে (বুখারী হা/২৪৪৯)।

২. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১।

৩. মুসলিম হা/২৫৮৮, মিশকাত হা/১৮৮৯।

৪. আল-ফাওয়ায়েদ, ৯৯ পৃ.।

৫. মুসলিম হা/৯১, মিশকাত হা/৫১০৭।

৬. ইবনু মাজাহ হা/৪২৫০, সনদ হাসান।

নফসের উপর বিজয়ী হওয়ার তাওফীক দান করেন। তখন সেই ব্যক্তি নিজের সম্মান বা অহংকারের চেয়ে সত্য এবং সঠিক পথকে বড় করে দেখতে শেখে। কারণ নফস সর্বদা নিজেকে সঠিক, নিখুঁত এবং অন্যদের চেয়ে অগ্রগামী প্রমাণ করতে চায়। ভুল স্বীকার করাকে সে নিজের পরাজয় বা দুর্বলতা হিসাবে দেখে। তাই যে ব্যক্তি এই ক্ষমতা অর্জন করতে পারে, সে নিঃসন্দেহে সৌভাগ্যবান এবং আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত।

ব্যক্তিগত বিকাশ ও আত্মশুদ্ধি : ভুল স্বীকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হ'ল ব্যক্তিগত বিকাশ। যখন কোন ব্যক্তি তার ভুলটি স্বীকার করে, তখন সে আত্ম-উপলব্ধির প্রথম ধাপে পা রাখে। নিজের কাজের দায়ভার গ্রহণ করার মাধ্যমে সে নিজেকে বিশ্লেষণের সুযোগ পায়। কেন ভুলটি হ'ল, কোন পরিস্থিতিতে হ'ল এবং ভবিষ্যতে কিভাবে তা এড়ানো যায়- এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই আত্মসমালোচনা ও আত্মশুদ্ধির পথ ধরেই একজন মানুষ আরও ব্যক্তিত্ববান, সুবিবেচক ও পরিণত হয়ে ওঠে। যে নিজের ভুল স্বীকার করতে পারে না, সে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করতে থাকে এবং তার মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ভুল স্বীকার করা বিবেকের ওপর জমে থাকা একটি ভারী পাথর নামিয়ে ফেলার মত, যা মানসিক প্রশান্তি ও স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনে।

সম্পর্ক উন্নয়ন ও বিশ্বাস স্থাপন : পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি হ'ল বিশ্বাস ও সততা। পরিবার, বন্ধুত্ব বা কর্মক্ষেত্রে সর্বত্রই বিশ্বাস এক অপরিহার্য উপাদান। যখন আমরা ভুল করে তা লুকিয়ে রাখি বা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দেই, তখন সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাসের দেয়াল তৈরি হয়। এটি সম্পর্ককে ভেতর থেকে দুর্বল করে দেয়। অন্যদিকে একজন ব্যক্তি যখন সাহসের সাথে নিজের ভুল স্বীকার করে এবং তার জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চায়, তখন তা অন্যের মনে তার প্রতি সম্মান বাড়িয়ে দেয়। একটি অকপট স্বীকারোক্তি সাময়িকভাবে কিছুটা অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করলেও দীর্ঘ মেয়াদে তা সম্পর্ককে আরও মযবূত ও স্বচ্ছ করে। এটি প্রমাণ করে যে, ব্যক্তির কাছে সম্পর্কের মূল্য তার অহমিকার চেয়ে অধিক।

সামাজিক ও পেশাগত জীবনে গুরুত্ব : পেশাগত জীবনে ভুল স্বীকারের গুরুত্ব অপরিসীম। কর্মক্ষেত্রে একটি ছোট ভুলও যদি সময়মতো স্বীকার করা না হয়, তবে তা পরবর্তীতে বড় ধরনের ক্ষতি বা বিপর্যয়ের কারণ হ'তে পারে। যে কর্মী বা নেতা নিজের ভুল স্বীকার করে তা সংশোধনের চেষ্টা করেন, তিনি একটি দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ কর্মপরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করেন। একজন দায়িত্বশীল যখন নিজের ভুল স্বীকার করেন, তখন তার কর্মীদের মধ্যে তার প্রতি বিশ্বাস ও সম্মান আরো বৃদ্ধি পায়। এর মাধ্যমে টীমে বা সংগঠনে একটি ইতিবাচক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যেখানে প্রত্যেকেই ভুল থেকে শিখতে উৎসাহিত হয় এবং একে অপরকে দোষারোপ করার পরিবর্তে সমাধানের দিকে মনোনিবেশ করে।

পারিবারিক জীবনে ভুল স্বীকারের গুরুত্ব : পারিবারিক জীবনেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ গুণ, যা পরিবারের ভিত্তি মযবূত করে এবং সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের গভীরতা, বিশ্বাস ও সম্মান বৃদ্ধি পায়। যখন একজন সদস্য তার ভুল মেনে নেয়, তখন তা তার সততা এবং বিনয়ের পরিচয় বহন করে। এর ফলে অহংকার ও যিদের মতো ক্ষতিকর বিষয়গুলো দূর হয়, যা প্রায়শই পারিবারিক অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষত স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক ভুল স্বীকার আরো গুরুত্বপূর্ণ, যা দাম্পত্য জীবনকে আরও মযবূত ও মধুর করে তোলে। যখন স্বামী বা স্ত্রী নিজের ভুল স্বীকার করে নেন, তখন তা কেবল একটি সাধারণ ক্ষমা চাওয়া হয় না, বরং এটি জীবনসঙ্গীর প্রতি সম্মান ও ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। পারস্পরিক ভুল স্বীকারের মধ্য দিয়ে একে অপরকে আরও ভালোভাবে বুঝতে শেখে এবং তাদের মধ্যেকার মানসিক বন্ধন দৃঢ় হয়। এটি কেবল বর্তমানের সমস্যাই সমাধান করে না, বরং ভবিষ্যতে বড় ধরনের সংঘাত এড়াতেও সাহায্য করে।

নবী জীবনে ভুল স্বীকারের অনন্য নিদর্শন :

হযরত আদম (আঃ) : আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ) ও হাওয়া (আঃ) শয়তানের প্ররোচনায় আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে ফেলেছিলেন। যখন তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন, তখন তারা বিনীতভাবে নিজেদের ভুল স্বীকার করে আল্লাহ্র দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেছিলেন, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এক্ষণে যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহ'লে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*। তাদের এই আকুতিভরা প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন এবং তাদের ক্ষমা করে দেন।

পক্ষান্তরে ইবলীস অহংকারবশত নিজের ভুল স্বীকার করেনি। বরং সে আল্লাহ্র সিদ্ধান্তকে দোষারোপ করে এবং বিতর্কে লিপ্ত হয়। ফলে সে চিরদিনের জন্য অভিশপ্ত ও বিতাড়িত হয়। এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, ভুল স্বীকার করা নবীদের গুণ এবং আল্লাহ্র রহমত লাভের উপায়। আর অহংকার ও নিজ ভুলে অটল থাকা শয়তানের বৈশিষ্ট্য।

হযরত ইউনুস (আঃ) : ইউনুস (আঃ) তাঁর সম্প্রদায়ের উপর হতাশ হয়ে আল্লাহ্র নির্দেশের অপেক্ষা না করেই কর্মস্থল ত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীতে যখন তিনি মাছের পেটে বন্দী হন, তখন নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্র কাছে এই বলে দো'আ করেন, لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ অর্থাৎ '(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আর নিশ্চয়ই আমি

সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*।

তাঁর এই অকপট স্বীকারোক্তি এবং আকুল প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করেন এবং তাঁকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন।

হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জীবন থেকে :

বদর যুদ্ধের ময়দানে : বদর যুদ্ধের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি তীর দিয়ে সৈন্যদের কাতার সোজা করছিলেন। এমন সময় সাওয়াদ ইবনে গাযিইয়াহ (রাঃ) নামে এক ছাহাবী সারি থেকে কিছুটা এগিয়ে ছিলেন। রাসূল (ছাঃ) তীর দিয়ে তার পেটে হালকা খোঁচা দিয়ে সোজা হ'তে বলেন। সাওয়াদ (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! أَوْجَعْتَنِي وَقَدْ بَعَثَكَ اللهُ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ، فَأَقِدْنِي 'আপনি আমাকে কষ্ট দিয়েছেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে সত্য ও ন্যায়বিচারসহ প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমাকে এর প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দিন। রাসূল (ছাঃ) তৎক্ষণাৎ নিজের পেটের কাপড় তুলে ধরে বললেন, 'সাওয়াদ, প্রতিশোধ গ্রহণ করো'।

কিন্তু সাওয়াদ (রাঃ) প্রতিশোধ না নিয়ে রাসূল (ছাঃ)-কে জড়িয়ে ধরে তাঁর পেটে চুমু খেলেন। তারপর বললেন, যুদ্ধের ময়দানে যাওয়ার আগে তার জীবনের শেষ ইচ্ছা ছিল, তাঁর শরীরের চামড়া যেন রাসূল (ছাঃ)-এর পবিত্র শরীরকে স্পর্শ করে। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য কল্যাণের দো'আ করলেন।[৭] অতঃপর তিনি যুদ্ধে শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করলেন।[৮]

খেজুর গাছের পরাগায়ন বিষয়ে ভুল থেকে প্রত্যাবর্তন : হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় এসে দেখলেন, সেখানকার অধিবাসীরা পুরুষ খেজুর গাছের পরাগরেণু নিয়ে স্ত্রী খেজুর গাছের ফুলের সাথে মিশিয়ে দিচ্ছেন (কৃত্রিম পরাগায়ন করছেন)। বিষয়টি দেখে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত ধারণা থেকে তাদের বললেন, 'আমার মনে হয়, তোমরা এটি না করলেও ফলন ভাল হবে'। ছাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার কারণে তাঁর কথা মেনে নিয়ে সে বছর আর কৃত্রিম পরাগায়ন করলেন না। কিন্তু এর ফলে সে বছর খেজুরের ফলন খুবই কম বা মন্দ হ'ল। বিষয়টি রাসূল (ছাঃ) জানতে পেরে বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তাঁর অবস্থান তুলে ধরে বললেন, إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيِي، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ 'আমি তো কেবল একজন মানুষ। যখন আমি দ্বীনের কোন বিষয়ে তোমাদের নির্দেশ দেই, তখন তা আঁকড়ে ধরবে। কিন্তু যখন আমি আমার ব্যক্তিগত মত থেকে কোন কথা বলি, তখন আমি (অন্যদের মতোই) একজন মানুষ মাত্র'। অন্য বর্ণনা মতে তিনি বলেন, أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ 'দুনিয়াবী বিষয়ে তোমরাই সবচেয়ে ভালো জান'।[৯]

৭. *সীরাতু ইবনে হিশাম ১/৬২৬; আল-বিদায়াহ ৩/২৭১; ছহীহাহ হা/২৮৩৫।*
৮. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ৩/১৮০ পৃ.।*
৯. *মুসলিম হা/২৩৬২; মিশকাত হা/১৪৭।*

শিক্ষা : ঘটনা দু'টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মহৎ চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রথমটিতে তার ন্যায়বিচার, বিনয় এবং নিজের সামান্য কাজ দ্বারা কেউ কষ্ট পেলে সাথে সাথে তার প্রতিকার করার মানসিকতার এক অসাধারণ উদাহরণ।

দ্বিতীয় ঘটনায় প্রমাণিত হয় যে, তিনি বিশ্বজগতের নেতা ও আল্লাহ্‌র নবী হওয়া সত্ত্বেও নিজের ব্যক্তিগত একটি ধারণা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় তা স্বীকার করতে সামান্যও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এটি শিক্ষা দেয় যে, ভুল স্বীকার করা দুর্বলতা নয়, বরং সততা, বিনয় ও মহত্ত্বের লক্ষণ।

ছাহাবায়ে কেরামের জীবন থেকে ভুল স্বীকারের নিদর্শন :

ছাহাবায়ে কেরাম ছিলেন সত্যের মাপকাঠি এবং আমাদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। তাঁরা মানুষ হিসাবে ভুলের ঊর্ধ্বে ছিলেন না। কিন্তু তাঁদের মহত্ত্ব ছিল এখানেই যে, ভুল হওয়ার সাথে সাথেই তাঁরা তা অকপটে স্বীকার করে নিতেন এবং অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। নিম্নে তাঁদের জীবন থেকে ভুল স্বীকারের কিছু অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা তুলে ধরা হ'ল।-

হযরত আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর ঘটনা :

একদিন রাসূল (ছাঃ)-এর প্রধান দুই সাথী হযরত আবুবকর (রাঃ) ও ওমর (রাঃ)-এর মধ্যে কোন একটি বিষয়ে আলাপ চলছিল। আলাপের এক পর্যায়ে আবুবকর (রাঃ)-এর কোন কথায় ওমর (রাঃ) রাগান্বিত হন এবং রাগের বশেই তাঁকে ছেড়ে সেখান থেকে চলে যান।

নিজের কথায় প্রিয় বন্ধুর মনে কষ্ট দিয়েছেন বুঝতে পেরে আবুবকর (রাঃ) সাথে সাথেই অনুতপ্ত হ'লেন। তিনি ওমর (রাঃ)-এর পিছু পিছু ছুটলেন এবং তাঁকে মাফ করে দেওয়ার জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ করতে লাগলেন। কিন্তু ওমর (রাঃ) তখন এতটাই রাগান্বিত ছিলেন যে, তিনি কোন কথা না শুনে নিজের ঘরে প্রবেশ করেন এবং আবুবকর (রাঃ)-এর মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেন।

ওমর (রাঃ)-এর এমন আচরণে অত্যন্ত ব্যথিত ও চিন্তিত হয়ে আবুবকর (রাঃ) সোজা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হ'লেন। আবুবকর (রাঃ)-এর এমন অবস্থা দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমাদের এই সাথী নিশ্চয়ই কারো সাথে ঝগড়া করে এসেছে'।

আবুবকর (রাঃ) সালাম দিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ও ওমর-এর মধ্যে একটা কিছু ঘটে গিয়েছিল। আমি তার প্রতি কিছুটা রূঢ় আচরণ করে ফেলেছি। পরে আমি অনুশোচনা করেছি এবং তার কাছে ক্ষমা চেয়েছি, কিন্তু সে আমাকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করেছে। তাই আমি আপনার কাছে এসেছি'। তাঁর কথা শুনে নবী করীম (ছাঃ) তিনবার বললেন, 'হে আবুবকর! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন'।

এদিকে ওমর (রাঃ)-এরও রাগ কমে গিয়েছিল এবং নিজের আচরণের জন্য তাঁর মনে অনুশোচনা জেগেছিল। তিনি লজ্জিত হয়ে আবুবকর (রাঃ)-এর বাড়িতে গেলেন। কিন্তু তাঁকে পেলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন, আবুবকর (রাঃ)

নিশ্চয়ই নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে গিয়েছেন। এরপর ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর দরবারে এসে সালাম দিয়ে বসলেন এবং পুরো ঘটনা আনুপূর্বিক বর্ণনা করলেন। নিজের সাথী আবুবকর (রাঃ)-এর প্রতি এমন আচরণ করা হয়েছে শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা মোবারক রাগে লাল হয়ে উঠল।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাগান্বিত চেহারা দেখে আবুবকর (রাঃ) ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, তাঁর কারণে হয়তো ওমর (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূলের রোষানলে পড়বেন। তাই তিনি সাথে সাথে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন এবং বলতে লাগলেন, يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَأَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্র কসম, আমিই যুলুম করেছি!'

তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উপস্থিত সাহাবীদের দিকে ফিরে বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে তোমাদের কাছে রাসূল করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু (প্রথমে) তোমরা বলেছিলে, 'তুমি মিথ্যা বলছ, আর একমাত্র আবুবকর বলেছিল, 'আপনি সত্য বলছেন। সে তার জান ও মাল দিয়ে আমাকে সর্বাত্মক সহায়তা করেছে। এমতাবস্থায় তোমরা কি আমার জন্য আমার এই সাথীকে ত্যাগ করবে? তোমরা কি আমার জন্য আমার সাথীকে ত্যাগ করবে?'। এই কথাটি তিনি দু'বার পুনরাবৃত্তি করলেন। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, এই ঘটনার পর আর কখনো কেউ আবুবকর (রাঃ)-কে কোন কষ্ট দেয়নি।[১০]

হযরত আবুবকর ও রাবী'আহ (রাঃ)-এর ঘটনা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একজন খাদেম ছিলেন রাবী'আহ আল-আসলামী (রাঃ)। একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে এবং হযরত আবুবকর (রাঃ)-কে এক খণ্ড জমি দান করেন। কিছুদিন পর তাদের জমির সীমানায় থাকা একটি খেজুরের কাঁদি নিয়ে দু'জনের মধ্যে বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্কের এক পর্যায়ে হযরত আবুবকর (রাঃ) রাবী'আহ (রাঃ)-কে এমন একটি কথা বলেন, যা তার জন্য খুবই পীড়াদায়ক ছিল। কিন্তু কথাটি বলার সাথে সাথেই হযরত আবুবকর (রাঃ) প্রচণ্ড অনুতপ্ত হন। তিনি রাবী'আহ (রাঃ)-কে অনুরোধ করেন, يَا رَبِيعَةُ رُدَّ عَلَيَّ مِثْلَهَا حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا 'তুমিও আমাকে ঠিক একই রকম কথা বলে প্রতিশোধ নাও, যাতে তার আমার মন্দ কথার বিচার (ক্বিছাছ) হয়ে যায়'। কিন্তু রাবী'আহ (রাঃ) এই মহৎ মানুষটির প্রতি প্রতিশোধ নিতে অস্বীকৃতি জানান।

আবুবকর (রাঃ) বললেন, তুমি অবশ্যই (আমাকে মন্দ কথা) বলবে নতুবা তোমার বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নালিশ করব। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালে আবুবকর (রাঃ) আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট গমন করলেন।

একটু পর রাবী'আহ (রাঃ)ও রওয়ানা হলেন। পথে তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে আবুবকরের বিরুদ্ধে সাহায্য করতে চাইলেও তিনি তাদের বারণ করেন। তিনি বলেন, 'তোমরা কি জানো তিনি কে? তিনি আবুবকর ছিদ্দীক। তাঁর ক্রোধের কারণে রাসূল (ছাঃ) ক্রোধান্বিত হবেন, আর তাঁদের দু'জনের ক্রোধের কারণে আল্লাহ ক্রোধান্বিত হবেন, ফলে আমি ধ্বংস হয়ে যাব'।

অবশেষে তাঁরা দু'জনেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে পৌঁছান। সব শুনে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) রাবী'আহ (রাঃ)-কে বললেন, أَجَلْ فَلاَ تَرُدَّ عَلَيْهِ وَلَكِنْ قُلْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ 'না, তুমি তাঁর কথার জবাবে কটু কথা বলবে না। বরং তুমি বলো, হে আবুবকর! আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন'। রাসূল (ছাঃ)-এর এই মহান শিক্ষা শ্রবণ করে হযরত আবুবকর (রাঃ) কাঁদতে কাঁদতে ফিরে গেলেন।[১১]

শিক্ষা : ঘটনা দু'টি ভুল স্বীকার, বিনয় এবং ক্ষমার এক অসাধারণ শিক্ষা প্রদান করে। যেখানে আমরা দেখতে পাই, ইসলামের প্রথম খলীফা আবুবকর (রাঃ) এত উচ্চ মর্যাদাশীল মানুষ হওয়া সত্ত্বেও সামান্য ভুলের জন্য কতটা অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং সাথে সাথে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন।

তিনি কেবল অনুতপ্ত হয়েই থেমে থাকেননি, বরং দুনিয়াতেই এর প্রতিবিধান (ক্বিছাছ) চেয়েছেন, যাতে আখেরাতে তাঁকে লজ্জিত হ'তে না হয়। এটি ভুলের দায়ভার গ্রহণ করার এবং নিজেকে পরিশুদ্ধ করার সর্বোচ্চ মানসিকতার পরিচায়ক। নিজের অবস্থান বা মর্যাদার কথা চিন্তা না করে ভুল স্বীকার করা তাঁর মহত্ত্বের অনন্য নিদর্শন। এই মানসিকতাই একজন মুমিনকে আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র করে তোলে এবং সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করে।

হাতেব বিন আবী বালতা' (রাঃ)-এর ঘটনা :

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হাতেব বালতা' (রাঃ) ছিলেন একজন বদরী ছাহাবী। কিন্তু মক্কায় তাঁর পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদ রয়ে গিয়েছিল, যাদের দেখাশোনা করার মতো কোন আত্মীয়-স্বজন সেখানে ছিল না। তিনি ভাবলেন, যদি মক্কার কুরায়েশদেরকে গোপনে মুসলিম বাহিনীর আগমনের খবর জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান, তাহলে হয়তো তারা তাঁর পরিবারের উপর কোন অত্যাচার করবে না। এই ভেবে তিনি এক মহিলার মাধ্যমে কুরায়েশদের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন।

এদিকে অহি-র মাধ্যমে রাসূল (ছাঃ) বিষয়টি জানতে পেরে একটি দল পাঠিয়ে চিঠিটি উদ্ধারের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর হাতেব (রাঃ)-কে ডেকে পত্র প্রেরণের কারণ জানতে চান। তিনি কোন গোপনীয়তার আশ্রয় না নিয়ে অকপটে নিজের ভুল স্বীকার করে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)!

১০. বুখারী হা/৪৬৪০, ৩৬৬১।

১১. আহমাদ হা/১৬৬২৭, ছহীহাহ হা/৩২৫৮।

আল্লাহ্র কসম, আমি ইসলাম ত্যাগ করিনি বা কুফরীও করিনি। বরং আমি আমার পরিবার-পরিজন ও সম্পদ রক্ষার্থে এরূপ করে ফেলেছি। জবাব শুনে হযরত ওমর (রাঃ) ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'অনুমতি দিন, আমি এই মুনাফিকের গর্দান উড়িয়ে দেই'।

রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'হে ওমর! সে কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নয়? আর তুমি কি জানো না তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ 'তোমরা যা ইচ্ছা আমল করো, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি'। অন্য বর্ণনা মতে, তোমাদের জন্য আমি জান্নাতকে ওয়াজিব করে দিয়েছি'। এই কথা শুনে ওমর (রাঃ)-এর চোখ দিয়ে অশ্রু গড়াতে লাগল।[১২]

কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ)-এর ঘটনা

তাবূক ছিল ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম কষ্টকর এক যুদ্ধ। প্রচণ্ড গরম, দীর্ঘ পথ এবং রসদের স্বল্পতা ছিল। রাসূল (ছাঃ) এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য সকল সক্ষম মুসলমানকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) সহ তিনজন ছাহাবী সঙ্গত কোন কারণ ছাড়াই অলসতাবশত যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকেন।

যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর মুনাফিকরা বিভিন্ন মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করে। কিন্তু হযরত কা'ব (রাঃ) তার দুই সাথীসহ রাসূল (ছাঃ)-এর সামনে উপস্থিত হয়ে অকপটে স্বীকার করেন যে, তাঁর কোন ওযর ছিল না, স্রেফ আলস্যের কারণেই তিনি যেতে পারেননি।

রাসূল (ছাঃ) তাদের সততার কারণে বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ছেড়ে দেন এবং সকল মুসলমানকে তাঁদের সাথে কথাবার্তা বন্ধ করে সামাজিক বয়কটের নির্দেশ দেন। এই বয়কট পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এই পঞ্চাশ দিন ছিল তাঁদের জীবনের সবচেয়ে কঠিন সময়। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি কুরআনের আয়াত (সূরা তওবা ১১৭-১১৮) নাযিল করে তাঁদের তওবা কবুল করেন এবং তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।[১৩]

শিক্ষা : একদিকে দীর্ঘ ও কঠিন পরীক্ষা, অন্যদিকে সরাসরি আয়াত নাযিলের মাধ্যমে মহান প্রতিপালকের পক্ষ থেকে মাগফিরাত লাভের মহাসৌভাগ্য!... এথেকে স্পষ্ট হয় যে, ভুল স্বীকার করে সত্যের উপর অটল থাকার পুরস্কার কত বড়। মিথ্যা সাময়িক মুক্তি দিলেও চূড়ান্ত সফলতা ও সম্মান সত্যের পথেই নিহিত।

ভুল স্বীকার না করার পরিণতি :

ভুল করা মানব চরিত্রের একটি স্বাভাবিক অংশ। কিন্তু সেই ভুল স্বীকার না করা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। যেমন :

ব্যক্তিগত বিকাশের পথ রুদ্ধ হয় : যে ব্যক্তি ভুল স্বীকার করে না, সে তার ভুল থেকে শিখতে পারে না। ফলে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে এবং তার জ্ঞান ও দক্ষতার বিকাশ থেমে যায়। আবার ক্রমাগত ভুল অস্বীকার করার ফলে ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের মিথ্যা অহমিকা তৈরি হয়। সে নিজেকে নির্ভুল ভাবতে শুরু করে, যা তার বাস্তব জ্ঞানকে বাধাগ্রস্ত করে। আবার নিজের ভুলকে ঢাকার জন্য তাকে ক্রমাগত মিথ্যা বলতে হয় বা অজুহাত তৈরি করতে হয়। ফলে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ বৃদ্ধি পায়।

সম্পর্কে অবনতি ঘটে : পরিবার, বন্ধুত্ব বা কর্মক্ষেত্রে ভুল স্বীকার না করলে তার প্রতি অন্যের আস্থা ও বিশ্বাস নষ্ট হয়। তৈরী হয় মতবিরোধ, ক্ষোভ ও মানসিক দূরত্ব। ভেঙে যায় দীর্ঘদিনের সম্পর্কও। জেনেবুঝে ভুল অস্বীকার করলে তার সাথে খোলাখুলি ও সৎ আলোচনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, যা সম্পর্কের জন্য অপরিহার্য।

কর্মজীবন ও সামাজিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব : যে ব্যক্তি কখনোই নিজের ভুল মেনে নেয় না, তাকে সমাজ এড়িয়ে চলতে শুরু করে। ফলে সে একসময় সামাজিকভাবে একা ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কর্মক্ষেত্রে ভুল স্বীকার না করলে সহকর্মী ও কর্তৃপক্ষের কাছে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়। এর ফলে সহকর্মীদের মাঝে তার প্রতি ভালোবাসা, সুধারণার ঘাটতি হয়। সহানুভূতি হ্রাস পায়। তার সাথে অন্যদের দলগত কাজে সমস্যা তৈরি হয়। একইভাবে একজন দায়িত্বশীল যদি তার ভুল সিদ্ধান্ত স্বীকার না করেন, তাহ'লে পরিষদের অন্য সদস্যরা তার ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলে। যা একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে বড় বাধা সৃষ্টি করে।

উপসংহার :

ভুল স্বীকার করা দুর্বলতা নয়, বরং এটি এক প্রকার শক্তি; যা মানুষকে নৈতিকভাবে বলীয়ান করে তোলে। যে সমাজে ভুল স্বীকারকে দুর্বলতা হিসাবে না দেখে, বরং শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগ হিসাবে দেখা হয়, সেই সমাজই প্রকৃত অর্থে সভ্য ও উন্নত। এটি ব্যক্তির বিনয়, সততা এবং আল্লাহভীতির পরিচায়ক। যখন সমাজে ভুল স্বীকার করার সংস্কৃতি চালু থাকে, তখন পারস্পরিক সম্পর্কগুলো সুন্দর ও মযবূত হয়। মনোমালিন্য দূর হয় এবং সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়।

আসুন, আমরা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই মহৎ গুণটির চর্চা করি। কোন ভুল হয়ে গেলে তা স্বীকার করতে কুণ্ঠাবোধ না করি। অহংকারকে বিসর্জন দিয়ে বিনয়ের পথ অবলম্বন করি। রাব্বে কারীমের নিকটে অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা চাই এবং মানুষের হক নষ্ট করলে তার কাছেও ক্ষমা চেয়ে নেই। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল এবং তিনি তওবাকারীকে ভালোবাসেন। রাব্বুল 'আলামীন আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

---

১২. বুখারী হা/৬৯৩৯, মিশকাত হা/৬২১৬।
১৩. বুখারী হা/৪৪১৮।

ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব

*-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ**

ভূমিকা :

ইলম ও আমল দ্বীনের অবিচ্ছেদ্য দু’টি অংশ। এ দু’টি বিষয়ের যথাযথ সমন্বয় ছাড়া মুমিন জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অথচ বর্তমানে মুসলমানদের মাঝে ইলম ও আমলের যথার্থ সমন্বয় খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর। আমরা অনেকেই ইসলামকে জানি, কিন্তু সেই ইসলামী জ্ঞানের আলোকে জীবনকে গড়তে পারি না। আমরা কুরআন-হাদীছ পড়ি, ইসলামী বই অধ্যয়ন করি, আলেমদের বক্তব্য শুনি, জুম‘আর খুৎবা শ্রবণ করি, দ্বীনী জ্ঞান চর্চার সাথে কম-বেশী যুক্ত থাকি, কিন্তু অর্জিত জ্ঞানের প্রতিফলন নেই আমাদের দৈনন্দিন আচরণে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, দাওয়াতের ময়দানে, রাজনীতিতে কিংবা পারিবারিক জীবনে। আমাদের ইলম যেন বইয়ের পাতায় বন্দী, আর আমল ও ইবাদত যেন কেবল প্রদর্শনী। ফলে দুর্বল হয়ে পড়েছে আমাদের ব্যক্তিত্ব, ভেঙে পড়েছে সামাজিক ভিত্তি, আমরা হারিয়ে ফেলেছি আদর্শিক স্বকীয়তা, খুইয়ে ফেলেছি আধ্যাত্মিক শক্তিমত্তা, আত্মমর্যাদা ও মুসলিম জাতিসত্তা। জ্ঞানের প্রদীপ হাতে থাকলেও আমলে শক্তি না থাকার কারণে আমরা যেন অন্ধকার জগতের এক দিশেহারা পথিক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ফুটে উঠেছে ঈমানী দুর্বলতার সুস্পষ্ট প্রভাব। আমরা যদি এই অবস্থা থেকে বের হয়ে না আসতে পারি, তবে দুনিয়াবী জীবনে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে, আর পরকালের মর্মন্তুদ শাস্তি তো আছেই। তাই জ্ঞান ও আমলের মাঝে সমন্বয় সাধনের নিমিত্তে এর গুরুত্ব ও ফযীলত জানা প্রয়োজন। বক্ষ্যমান নিবন্ধে ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব ও ফযীলত আলোচিত হয়েছে।

ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব

১. ইলম অনুযায়ী আমল করতে পারা তাক্বওয়ার পরিচায়ক :

তাক্বওয়া অর্থ আল্লাহভীতি। আর আল্লাহভীতি প্রকাশ পায় তখনই, যখন মানুষ তার অর্জিত জ্ঞানের আলোকে আমল সম্পাদন করে। শুধু মুখে তাক্বওয়ার দাবী করা যথেষ্ট নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মেনে চলা, হারাম ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকা, হালালকে আঁকড়ে ধরা প্রভৃতির মাধ্যমে তাক্বওয়ার স্বরূপ ফুটে ওঠে। ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন এযাম ও সালাফে ছালেহীনের জীবন ছিল ইলম ও আমলের সুন্দর সমন্বয়ে গড়া। ফলে তাঁদের জীবন ছিল তাক্বওয়ায় ভরপুর। ইসলামের চতুর্থ খলীফা আলী ইবনে আবী ত্বালেব (রাঃ) তাক্বওয়ার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، ‘মহান আল্লাহকে ভয় করে চলা, তাঁর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী আমল করা, অল্পে তুষ্ট থাকা এবং মৃত্যুর দিনের জন্য সদা প্রস্তুত থাকার সমন্বিত নাম হ’ল তাক্বওয়া’।[১] আলী (রাঃ) আরো বলেন, كونوا لقبول العمل أشد اهتماما منكم فإنّه لن يقلّ عمل مع التّقوى، وكيف يقلّ عمل بالعمل، متقبّل؟ ‘তোমরা আমল করার চেয়ে আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে বেশী গুরুত্ব দাও। কেননা তাক্বওয়ার সাথে সম্পাদিত কোন আমল অল্প হয় না, তাহ’লে কবুলযোগ্য আমল কিভাবে অল্প হবে?’[২] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ عَنْ كَثْرَةِ الحديث، إنما العلم خشية الله، ‘অনেক বেশী হাদীছ বর্ণনা করার নাম ইলম নয়; বরং আল্লাহভীতিই হ’ল প্রকৃত ইলম’।[৩]

মুতাররাফ ইবনে শিখখীর (মৃ. ৯৫হি.) বলেন, ‘আমলের শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে ইলমের মর্যাদা বেশী। আর তোমাদের উত্তম দ্বীন হ’ল পরহেযগারিতা’।[৪] মাসরূক্ব (রহঃ) বলেন, بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَخْشَى اللهَ، وَبِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الْجَهْلِ أَنْ يُعْجَبَ بِعِلْمِهِ، ‘কোন ব্যক্তির জ্ঞানী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, সে আল্লাহ্কে ভয় করবে। আর কোন লোকের মূর্খ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার অর্জিত জ্ঞান নিয়ে গর্ববোধ করবে’।[৫] অর্থাৎ অর্জিত ইলম তখনই মূল্যবান হয় যখন তা আমলে রূপান্তরিত হয়, হৃদয়ে তাক্বওয়ার স্ফূরণ ঘটার কারণ শুধুমাত্র জ্ঞানার্জন করা নয়, বরং সেই অনুযায়ী চলাই মানুষের সফলতার মাপকাঠি।

ওমর ইবনু আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, لَيْسَ تَقْوَى اللهِ بِصِيَامِ النَّهَارِ، وَلَا بِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَالتَّخْلِيطِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ تَقْوَى اللهِ تَرْكُ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَأَدَاءُ مَا افْتَرَضَ اللهُ، فَمَنْ رُزِقَ بَعْدَ ذَلِكَ خَيْرًا، فَهُوَ خَيْرٌ إِلَى خَيْرٍ، ‘দিনভর ছিয়াম পালন করা এবং রাত জেগে ছালাত আদায় করার পর হালাল হারামকে মিশিয়ে ফেলার নাম তাক্বওয়া নয়। বরং আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা পরিত্যাগ করা এবং যা বিধিবদ্ধ করেছেন, তা যথাযথভাবে আদায় করার নামই হ’ল

**. এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. মুহাম্মাদ ছালেহী আশ-শামী, সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৪হি./১৯৯৩খৃ.), ১/৪২১; মুহাম্মাদ ইবনে সালেম আল-মাজলীসী, লাওয়ামি‘উদ দুরার (মৌরিতানিয়া : দারুর রিযওয়ান, ১৪৩৬হি./২০১৫খৃ.), ১/১১০।

২. আবূ নু‘আইম ইছফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১/৭৫; সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ১১/২৯৯।

৩. শাত্বেবী, আল-মুওয়াফাক্বাত, মুহাক্কিক্ব : বকর আবূ যায়েদ (মিসর : দারু ইবনে আফ্ফান, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৭হি./১৯৯৭খৃ.), ১/১০২।

৪. ইবনু আব্দিল বার্র, জামি‘উ বায়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী, মুহাক্কিক্ব : আবুল আশবাল আয-যুহাইরী (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৪১৪হি./১৯৯৪খৃ.) ১/১১৩।

৫. খত্বীব বাগদাদী, আল-ফাক্বীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ২য় প্রকাশ, ১৪২১হি.), ২/৫৭।

তাক্বওয়া। আর যাকে এই তাক্বওয়ার পরেও উত্তম আমল করার তাওফীক্ব দেওয়া হয়েছে, সেটা তো আরোও ভালো'।[৬]

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, رَهْبَةُ العَبْدِ مِنَ اللهِ عَلَى قَدْرِ عِلْمِهِ بِاللهِ، وَزَهَادَتُهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَدْرِ رَغْبَتِهِ فِي الآخِرَةِ، مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اسْتَغْنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ سَاءَ خُلُقَهُ شَانَ دِيْنَهُ، وَحَسَبَهُ، وَمُرُوءَتَهُ، 'বান্দা আল্লাহকে যতটুকু জানে, ততটুকুই তাকে ভয় করে। সে আখেরাতের প্রতি যতখানি উন্মুখ থাকে, দুনিয়ার প্রতি সে ততটাই অনাগ্রহী হ'তে পারে। যে ব্যক্তি ইলম অনুযায়ী আমল করে, অজানা বিষয় থেকে সে অভাবমুক্ত হ'তে পারে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, আল্লাহ তাকে অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের তাওফীক্ব দান করেন। আর যার চরিত্র খারাপ হয়ে যায়, সে তার দ্বীন, সম্মান ও ব্যক্তিত্বকে কলুষিত করে ফেলে'।[৭]

ইবনু রজব হাম্বলী (রহঃ) বলেন, وافضلُ الأعمال خشية الله فِي السر والعلانية، وخشية الله فِي السر إنما تصدر عَن قوة إيمان ومجاهدةٍ للنفس والهوى، فإن الهوى يدعو فِي الخلوة إلى المعاصي، 'সবচেয়ে ফযীলতপূর্ণ আমল হ'ল প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা। মূলত ঈমানী শক্তি এবং প্রবৃত্তি ও নফসের বিরুদ্ধে জিহাদের শক্তিমত্তা থেকে গোপনে আল্লাহকে ভয় করার অনুভূতি জাগ্রত হয়। কেননা নির্জনতায় কুপ্রবৃত্তি সর্বদা পাপের দিকে আহ্বান জানায়'।[৮]

কবি মুহাম্মাদ ইবনে আবূ আলী ইছফাহানী বলেন,

اعْمَلْ بِعِلْمِكَ تَغْنَمْ أَيُّهَا الرَّجُلُ + لَا يَنْفَعُ الْعِلْمُ إِنْ لَمْ يَحْسُنِ الْعَمَلُ

وَالْعِلْمُ زَيْنٌ وَتَقوَى اللهِ زِينَتُهُ + وَالْمُتَّقُونَ لَهُمْ فِي عِلْمِهِمْ شُغُلُ

وَحُجَّةُ اللهِ يَا ذَا الْعِلْمِ بَالِغَةٌ + لَا الْمَكْرُ يَنْفَعُ فِيهَا لَا وَلَا الْحِيَلُ

تَعَلَّمِ الْعِلْمَ وَاعْمَلْ مَا اسْتَطَعْتَ بِهِ + لَا يُلْهِيَنَّكَ عَنْهُ اللَّهْوُ وَالْجَدَلُ

'ওহে! ইলম অনুযায়ী আমল কর, তবে তুমি পুরস্কৃত হবে। যার আমল সুন্দর হয় না, তার ইলম উপকারী হয় না। ইলম হ'ল শোভা আর আমল তার অলংকার। আর অর্জিত ইলমের ব্যাপারে মুত্তাক্বীদের দায়িত্ব রয়েছে। হে আলিম! ইলম আল্লাহ্র চূড়ান্ত হুজ্জাত (দলীল), সুতরাং এ ব্যাপারে কোন ধোঁকাবাজি ও অপকৌশল চলে না। ইলম অর্জন কর এবং সাধ্যানুযায়ী আমল কর। তর্ক ও উদাসীনতা যেন তোমাকে ইলম অনুযায়ী আমল করা থেকে বিরত না রাখে'।[৯]

২. আমলহীন ইলমের কোন মূল্য নেই :

যে ইলম আমল উৎপন্ন করে না, তা কেবল বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। কুরআনে বনী ইসরাঈলের সেই আলেমদের উদাহরণ এসেছে, যারা তাওরাত জানত; কিন্তু তাওরাতের বিধান অনুযায়ী আমল করত না। তাদেরকে গাধার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যে না বুঝেই শুধু বইয়ের বোঝা বহন করে। আল্লাহ বলেন, مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، 'যারা তাওরাত বহনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল, অতঃপর তারা তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত হ'ল গাধার মত, যে কিতাবের বোঝাসমূহ বহন করে। কতই না মন্দ সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহ্র আয়াত সমূহে মিথ্যারোপ করে' *(জুম'আ ৬২/৫)*। বর্তমান মুসলিম সমাজে এমন শিক্ষিত ব্যক্তির অভাব নেই, কিন্তু তাদের অনেকেই ইসলামী নীতি-আদর্শকে জীবনে প্রয়োগ করেন না। ফলস্বরূপ তাদের জ্ঞান সমাজে আলো ছড়ায় না।

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُعْمَلُ بِهِ كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل، 'যে ইলম অনুযায়ী আমল করা হয় না, তার উদাহরণ সেই গুপ্তধনের মতো যেখান থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করা হয় না'।[১০] সাহল তুসতারী (রহঃ) বলেন, العِلْمُ كُلُّهُ دُنْيَا، وَالْآخِرَةُ مِنْهُ الْعَمَلُ بِهِ، وَالْعَمَلُ كُلُّهُ هَبَاءٌ إِلَّا الإِخْلَاص، 'ইলম পুরোটাই দুনিয়াতে সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে শুধু সেই আমলই আখেরাতে কাজে আসবে, যে অনুযায়ী আমল করা হয়েছে। আর ইখলাছ ছাড়া সব আমল ধূলিকণায় পরিণত হবে'।[১১]

খতীব বাগদাদী (রহঃ) বলেন, كَمَا لَا تَنْفَعُ الْأَمْوَالُ إِلَّا بِإِنْفَاقِهَا، كَذَلِكَ لَا تَنْفَعُ الْعُلُومُ إِلَّا لِمَنْ عَمِلَ بِهَا، 'দান-ছাদাক্বা ছাড়া যেমন ধন-সম্পদ উপকারী হয় না; তেমনি অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করা ব্যতীত ইলমও উপকারী হয় না'।[১২] ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, صاحبُ الحديث عِندنا من يَستعمل الحديث، 'আমাদের নিকট আহলেহাদীছ সেই ব্যক্তি, যিনি হাদীছের উপর আমল করেন'।[১৩]

---

৬. ইবনু রজব হাম্বলী, জামে'উল 'উলূম ওয়াল হিকাম, তাহক্বীক: শু'আইব আরনাঊত্ব (বৈরূত : মুআস্সাতুর রিসালাহ, ৭ম সংস্করণ, ১৪২২হি./২০০১খৃ.), ১/৪০০।

৭. শামসুদ্দীন যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, মুহাক্বিক্ব : শু'আইব আরনাঊত্ব ও অন্যান্য (বৈরূত : মুআস্সাসাতুর রিসালাহ, ২য় সংস্করণ, ১৪০৫হি./১৯৮৫খৃ.), ৮/৪২৭।

৮. ইবনু রজব হাম্বলী, ফাৎহুল বারী ৬/৫০।

৯. খত্বীব বাগদাদী, ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, মুহাক্কিক্ব : নাছিরুদ্দীন আলবানী (বৈরূত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম মুদ্রণ, ১৪০৪হি./১৯৭৪খৃ.) পৃ. ৩৮।

১০. ইক্বতিযাউল ইলম আমল, পৃ. ২৪।

১১. গাযালী, ইহয়াউ উলূমিদ্দীন, ১/৬১।

১২. ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, পৃ. ১৬।

১৩. ইবনুল জাওযী, মানাক্বিবুল ইমাম আহমাদ, পৃ. ২৮৫।

আব্বাসী কবি আব্দুল্লাহ ইবনুল মু‘তায (২৪৭-২৯৬হি.) বলেন, عِلْمٌ بِلَا عَمَلٍ كَشَجَرَةٍ بِلَا ثَمَرَةٍ ‘আমল বিহীন ইলম ফলহীন গাছের মতো’।[১৪] সাঈদ ইবনে আব্বাস (রহঃ) বলেন, كُنْ عَالِمًا عَامِلًا فَقَدْ عَلِمَ أَقْوَامٌ وَلَمْ يَعْمَلُوا وَلَمْ يَكُنْ عِلْمُهُمْ إِلَّا عَلَيْهِمْ وَالْعِلْمُ وَالْعَمَلُ قَرِينَانِ لَا يَنْفَعُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِصَاحِبِهِ، ‘তুমি জ্ঞানী হও এবং সে অনুযায়ী আমলকারী হও। কেননা এমন কিছু লোক ছিল যারা ইলম অর্জন করেছিল, কিন্তু আমল করেনি। ফলে তাদের জ্ঞান তাদের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। ইলম ও আমল পরস্পরের সঙ্গী। একটি ছাড়া অপরটি কোন উপকার করতে পারে না’।[১৫]

শায়খ আব্দুল্লাহ ইবনে বায (রহঃ) বলেন, ولا ريب أن العلم هو مفتاح كل خير، وهو الوسيلة إلى أداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله، فإن العمل نتيجة العلم لمن وفقه الله، وهو مما يؤكد العزم على كل خير، فلا إيمان ولا عمل ولا كفاح ولا جهاد إلا بالعلم، فالأقوال والأعمال التي بغير علم لا قيمة لها، ولا نفع فيها بل تكون لها عواقب وخيمة، وقد تجر إلى فساد كبير، ‘নিঃসন্দেহে সকল কল্যাণের চাবিকাঠি হ’ল ইলম বা জ্ঞান। আল্লাহ্র ফরযকৃত বিধানের প্রতিপালন এবং তাঁর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহ বর্জনের প্রধান মাধ্যম এটাই। আল্লাহ যাকে তাওফীক্ব দান করেন তার জ্ঞানের ফলাফল হ’ল তার আমল। এটা প্রত্যেক কল্যাণকর কাজের সংকল্পকে সুনিশ্চিত করে। ইলমবিহীন ঈমান, আমল, সংগ্রাম ও জিহাদের কোন গুরুত্ব নেই। ইলমবিহীন কথা ও কাজের কোন মূল্য নেই। জ্ঞান বিহীন কোন কিছুতে উপকারিতা তো নেই; বরং রয়েছে মারাত্মক ক্ষতি, যা বড় ফাসাদের দিকে টেনে নিয়ে যায়’।[১৬]

হাস্সান ইবনু সিনান (রহঃ) বলেন, بَادِرِ انْقِطَاعَ عَمَلِكَ، فَإِنَّ الْمَوْتَ إِذَا جَاءَ انْقَطَعَ الْبُرْهَانُ، ‘তোমরা আমলের দরজা বন্ধ হওয়ার আগেই দ্রুত আমল কর। কেননা যখন মৃত্যু এসে যাবে, তখন সব যুক্তি-তর্ক বন্ধ হয়ে যাবে’।[১৭] আবূ সাঈদ আল-খাররায (রহঃ) বলেন, الْعِلْمُ مَا اسْتَعْمَلَكَ، وَالْيَقِينُ مَا حَمَلَكَ، ‘ইলম সেটাই যা তুমি আমল করেছ। আর ইয়াক্বীন বা দৃঢ় বিশ্বাস হ’ল যা তুমি (নিজের মধ্যে) ধারণ করেছ’।[১৮]

হাফছ ইবনু হুমায়দ (রহঃ) বলেন, আমি একবার দাউদ আত-তাঈ (রহ.)-এর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলাম। তিনি ছিলেন নম্র স্বভাবের মানুষ। তিনি বলেন, ‘তুমি কি যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোন যোদ্ধাকে দেখনি? সে যখন যুদ্ধের মুখোমুখি হ’তে চায়, তখন কি সে নিজের অস্ত্র-সরঞ্জাম সংগ্রহ করে না? কিন্তু যদি সে তার পুরো জীবন কেবল অস্ত্র-সরঞ্জাম জোগাড় করতেই ব্যয় করে ফেলে, তবে সে যুদ্ধ করবে কখন? জেনে রেখো, إِنَّ الْعِلْمَ آلَةُ الْعَمَلِ، فَإِذَا أَفْنَى عُمُرَهُ فِي جَمْعِهِ فَمَتَى يَعْمَلُ؟ ‘ইলম হ’ল আমলের অস্ত্র। আর যদি কেউ তার গোটা জীবন কেবল জ্ঞান আহরণেই ব্যয় করে ফেলে, তবে সে আমল করবে কখন?’[১৯] অতএব অর্জিত জ্ঞান তখন ফলপ্রসু ও উপকারী হবে, যখন সেটা আমলে বাস্তবায়ন করা হবে।

৩. শুধু ইলম অর্জন করে আলেম হওয়া যায় না :

যিনি বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থ মুখস্থ করেছেন বা কুরআন-হাদীছ ও ফিক্বহের বিধি-বিধান ও মাসআলা অধ্যয়ন করেছেন, তিনি কেবল তখনই সত্যিকারের আলেম হিসাবে গণ্য হবেন, যখন এইগুলো তার আমলে বাস্তবায়িত হবে। কেননা আমলহীন জ্ঞানী ব্যক্তিকে কখনোই আলেম গণ্য করা হয় না। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَثَلُ عِلْمٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ، كَمَثَلِ كَنْزٍ لَا يُنْفَقُ مِنْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ‘যেই ইলম অনুযায়ী আমল করা হয় না, সেটা এমন গচ্ছিত সম্পদের মতো যা থেকে আল্লাহ্র পথে খরচ করা হয় না’।[২০] যেমন সমাজের সব মুসলিমই ছালাতের গুরুত্ব জানে, কিন্তু ছালাত আদায় করে না; পাপাচার ও হারামের ভয়াবহতা জানে, কিন্তু তা পরিহার করে না; সততার ফযীলত জানে, কিন্তু লেনদেনে তা অবলম্বন করে না। এই অবস্থাই ঐ গচ্ছিত সম্পদের মতো- তা যত মূল্যবানই হোক, আল্লাহ্র পথে খরচ না করলে কোন উপকার দেয় না; উপরন্তু সেই সম্পদ ক্বিয়ামতের ময়দানে ব্যক্তির জন্য শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তদ্রূপ ইলম যতই মূল্যবান হোক না কেন, তা আমল ছাড়া আখেরাতে কোন উপকার করবে না; বরং ঐ ইলম তার শাস্তির কারণ হ’তে পারে। আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, لَا يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ مُتَعَلِّمًا، وَلَا يَكُونُ عَالِمًا حَتَّى يَكُونَ بِالْعِلْمِ عَامِلًا، ‘কোন ব্যক্তি আলেম হ’তে পারে না; যতক্ষণ না সে ছাত্র হয়। আর অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত কেউ আলেম হ’তে পারে না’।[২১]

ইবরাহীম আল-খাওয়াছ (মৃ. ২৯০হি.) বলেন, لَيْسَ الْعِلْمُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنِ اتَّبَعَ الْعِلْمَ، وَاسْتَعْمَلَهُ،

---

১৪. ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, পৃ. ৩৮।
১৫. আবূ নু‘আইম ইস্ফাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/৭২।
১৬. ইবনে বায, মাজমূ‘উ ফাতাওয়া, ৪/৫৯।
১৭. ইবনু আবীদ্দুনইয়া, ক্বাছরুল আমাল, পৃ.১১১।
১৮. ইবনুল ক্বাইয়িম, মাদারিজুস সালেকীন, (রিয়াদ : দারু আত্ব‘আতিল ইলম, ২য় মুদ্রণ, ১৪৪১হি./২০১৯খৃ.) ৩/১৭৭; আর-রিসালাতুল কুশাইরিয়াহ (কায়রো : দারুল মা‘আরেফ, তাবি) ১/৩২১।
১৯. ইক্বতিযাউল ইলমিল আমল, পৃ. ৪৪।
২০. সুনানে দারেমী হা/৫৭৫; মিশকাত হা/২৮০, সনদ হাসান।
২১. আবুল লায়েছ সামারকান্দী, তাম্বীহুল গাফেলীন (দামেশক: দারু ইবনি কাছীর, ২য় মুদ্রণ, ১৪২১হি./২০০০খৃ.), পৃ. ৪৩৩।

وَاقْتَدَى بِالسُّنَنِ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلَ الْعِلْمِ، 'অধিক বেশী (হাদীছ) বর্ণনা করার নাম প্রকৃত ইলম নয়। বরং প্রকৃত আলেম হ'ল সেই ব্যক্তি, যে ইলমের অনুসরণ করে, সে অনুযায়ী আমল করে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে, যদিও তার ইলম অতি সামান্য হয়'।[22] অর্থাৎ জ্ঞান শুধু বহুল পরিমাণে তথ্য সংগ্রহ করার নাম নয়, বরং তা অনুসরণ করে জীবনে বাস্তবায়ন করাই প্রকৃত আলেমের পরিচায়ক। যে ব্যক্তি অল্প জ্ঞান অর্জন করলেও তা হৃদয়ে স্থাপন করে, আমলে পরিণত করে এবং নবী কারীম (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণ করে, সে সত্যিকারের আলেমে দ্বীন।

ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, لَا يَزَالُ الْعَالِمُ جَاهِلًا بِمَا عَلِمَ حَتَّى يَعْمَلَ بِهِ، فَإِذَا عَمِلَ بِهِ كَانَ عَالِمًا، 'ইলম অনুযায়ী আমল না করা পর্যন্ত জ্ঞানী ব্যক্তি মূর্খই থেকে যায়। যখন আমল করে কেবল তখন সে আলেম হিসাবে গণ্য হয়'। তিনি আরো বলেন, إِنَّمَا يُرَادُ مِنَ الْعِلْمِ الْعَمَلُ، وَالْعِلْمُ دَلِيلُ الْعَمَلِ 'জ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য হ'ল আমল। আর ইলম আমলের দলীল স্বরূপ'।[23]

মালেক ইবনু দীনার বলেন, আমি হাসান বছরীকে জিজ্ঞাসা করলাম, ما عقوبة العالم إذا أحب الدنيا؟ 'একজন আলেম দুনিয়া আসক্ত হ'লে তার শাস্তি কি? তিনি উত্তর দিলেন, موت القلب، فإذا أحب الدنيا طلبها بعمل الآخرة، فعند ذلك ترحل عنه بركات العلم ويبقى عليه رسمه، 'অন্তর মরে যায়। সে দুনিয়া ভালোবেসে ফেললে আখিরাতের আমল দিয়ে দুনিয়া অন্বেষণ করে। তখন তার থেকে ইলমের বরকত উঠে যায়, শুধু আলেম পরিচয়টুকু থেকে যায়'।[24] ইবনুল মুবারক (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আলেমদের কি এমন কোন আলামত আছে, যেগুলো দিয়ে তাদেরকে চেনা যাবে?' তিনি বলেন, عَلَامَةُ العَالِمِ مَنْ عَمِلَ بِعِلْمِهِ، واستَقَلَّ كَثِيْرَ العِلْمِ مِنْ نَفْسِهِ، ورَغِبَ فِي عِلْمِ غَيْرِهِ، وقَبِلَ الحَقَّ مِنْ كُلِّ مَنْ أَتَاهُ بِهِ، وأَخَذَ العِلْمَ حَيْثُ وَجَدَهُ، فَهذِهِ عَلامَةُ العَالِمِ وصِفَتُهُ، 'আলেমের নিদর্শন হ'ল যে তার ইলম অনুযায়ী আমল করবে, নিজের অধিক জ্ঞানকেও সামান্য মনে করবে, অন্যের ইলমের প্রতি আগ্রহী হবে, হক যেখান থেকেই আসুক, সেটা গ্রহণ করবে, যেখানেই ইলম পাবে কুড়িয়ে নিবে। এগুলোই হ'ল আলেমের আলামত ও বৈশিষ্ট্য'।[25]

সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না (রহঃ) বলেন, يَوْمَ أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَبْدٌ فَجَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَفْضَلَ عَمَلًا مِنْهُ وَرَجُلٌ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يَتَصَدَّقْ مِنْهُ فَمَاتَ فَوَرِثَهُ غَيْرُهُ فَتَصَدَّقَ مِنْهُ، وَرَجُلٌ عَالِمٌ لَمْ يَنْتَفِعْ بِعِلْمِهِ فَعَلَّمَهُ غَيْرَهُ فَانْتَفَعَ بِهِ، 'ক্বিয়ামতের দিন তিন প্রকার মানুষ সবচেয়ে বেশী আফসোস করবে- (১) এমন ব্যক্তি, যার একজন ক্রীতদাস ছিল, যে ক্বিয়ামতের দিন তার চেয়ে উত্তম আমল নিয়ে উপস্থিত হবে, (২) এমন ব্যক্তি, যার সম্পদ ছিল, কিন্তু সে তার জীবদ্দশায় তা থেকে দান-ছাদাক্বাহ করতে পারেনি, তবে সে মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীরা তা থেকে দান করেছে এবং (৩) এমন ব্যক্তি, যে নিজে আলেম ছিল, কিন্তু সে তার ইলম দ্বারা উপকৃত হ'তে পারেনি, তবে সে অন্যদের শিক্ষা দিয়েছিল এবং সে সেই ইলম দ্বারা উপকৃত হয়েছে'।[26]

হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, فَلَيْسَ الْعِلْمُ كَثْرَةَ وَالْبَحْثِ وَالْكَلَامِ، وَلَكِنْ نُورٌ يَمِيزُ بِهِ صَحِيحَ الْأَقْوَالِ النَّقْلِ مِنْ سَقِيمِهَا، وَحَقَّهَا مِنْ بَاطِلِهَا، وَمَا هُوَ مِنْ مِشْكَاةِ النُّبُوَّةِ مِمَّا هُوَ مِنْ آرَاءِ الرِّجَالِ، 'অধিক হাদীছ বর্ণনা করা, অনুসন্ধান করা ও আলোচনা করার নাম ইলম নয়। কেননা ইলম হ'ল আলো, যার মাধ্যমে অশুদ্ধ কথামালার মধ্য থেকে সঠিক কথা পৃথক করা যায় এবং বাতিল কথা থেকে সত্য কথাকে আলাদা করা যায়। আর ইলম কোন মানুষের মতামত থেকে নির্গত ভবিষ্যদ্বাণীর দ্বীপাধার নয়'।[27]

৪. ইলম অনুযায়ী অল্প আমলই যথেষ্ট হয়ে যায় :

আল্লাহ্র কাছে আমলের পরিমাণের চেয়ে মান ও কোয়ালিটি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সামান্য সৎকর্মও ইখলাছ ও আন্তরিকতার সাথে সম্পন্ন হ'লে আল্লাহ তা কবুল করেন এবং এর মাধ্যমে বান্দাকে জান্নাত দান করেন। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ، خُذُوا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا، وَإِنَّ أَحَبَّ الأَعْمَالِ إِلَى اللهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ، 'হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী আমল করতে থাক। কারণ আল্লাহ (ছওয়াব দানে) ক্লান্তিবোধ করেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমল সম্পাদনে) ক্লান্ত হয়ে পড়। আর আল্লাহ্র নিকট ঐ আমল সবচেয়ে প্রিয়, যা অল্প হ'লেও নিয়মিত করা হয়'।[28]

---

২২. *শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম (সঊদী আরব : দারু ইবনিল জাওযী, ১ম মুদ্রণ, ১৪২৯হি./২০০৮খৃ.) ১/১৬৭।*
২৩. *ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক্ব, তাহক্বীক: মুছতাফা আব্দুল ক্বাদের আত্বা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১৭হি.), ৪৮/৪২৭।*
২৪. *হাফেয ইবনে কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দামেশক্ব : দারু ইবনে কাছীর, ৩য় মুদ্রণ, ১৪৩৪হি./২০১৩খৃ.), ১০/১০৯।*
২৫. *আবুল হাসান ইবনে আবী ইয়া'লা, ত্বাবাক্বাতুল হানাবিলাহ (সঊদী আরব : দারাতুল মালেক আব্দুল আযীয, ১৪১৯হি./১৯৯৯খৃ.), ৩/২৬৭।*
২৬. *হিলয়াতুল আউলিয়া ৭/২৮৮।*
২৭. *ইবনুল ক্বাইয়িম, ইজতিমা'উল জুয়ূশ আল-ইসলামিয়্যাহ (রিয়াদ : দারু আত্বাআতিল ইলম, ১৪৪০হি./২০১৯খৃ.), ২/৮৮।*
২৮. *বুখারী হা/৫৮৬১; মুসলিম হা/৭৮২।*

অনেক সময় দেখা যায়, কেউ কোন বিষয়ে ইলম অর্জনের পর শুরুতে প্রবল উৎসাহে বড় বড় আমল শুরু করেন। একসাথে বহু নফল ছালাত আদায়, দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তেলাওয়াত, সুদীর্ঘ ক্বিয়ামুল লায়ল ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ আমল করেন। কিন্তু কিছুদিন পর ব্যস্ততা, ক্লান্তি বা আগ্রহের ঘাটতির কারণে সেই আমল ছেড়ে দেন, ফলে ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যায়। অথচ অত্র হাদীছের শিক্ষা হ'ল অল্প হ'লেও নিয়মিত আমল আল্লাহ্র কাছে অধিক প্রিয়। কারণ জ্ঞান যখন আমলে রূপ নেয়, তখন তা হৃদয়ে প্রোথিত হয় এবং স্থায়ী প্রভাব ফেলে। যেমন কেউ যদি প্রতিদিন মাত্র দুই রাক'আত তাহাজ্জুদ ছালাত নিয়মিত আদায় করেন বা প্রতিদিন অনুধাবন করে কুরআনের পাঁচটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, তবে তা মাঝে মধ্যে বিশাল আমল করার চেয়ে অধিক মূল্যবান ও গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা আল্লাহ্র নিকট আমলের ইখলাছ ও স্থায়িত্বই আসল, পরিমাণ নয়।

মালেক ইবনু দীনার (রহঃ) বলেন, مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِنَفْسِهِ فَالْقَلِيلُ مِنْهُ يَكْفِي، وَمَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِحَوَائِجِ النَّاسِ فَحَوَائِجُ النَّاسِ كَثِيرَةٌ، 'যে ব্যক্তি নিজের জন্য ইলম অর্জন করে, তার জন্য অল্প ইলমই যথেষ্ট হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি মানুষের প্রয়োজনে ইলম শিখে, (সে জেনে রাখুক) মানুষের প্রয়োজন অফুরন্ত'।[২৯]

ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহঃ) বলেন, من طلب العلم خالصا لينتفع به عباد الله وينفع نفسه كان الخمول أحب إليه من التطاول، فذلك الذي يزداد في نفسه ذلا، وفي العبادة اجتهادا، ومن الله خوفا، وإليه اشتياقا، وفي الناس تواضعا، 'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠভাবে নিজে উপকৃত হওয়ার জন্য এবং আল্লাহ্র অপর বান্দাকে উপকৃত করার জন্য ইলম শিখে, মানুষের কাছে সুপরিচিত হওয়ার চেয়ে অখ্যাতিই তার কাছে অধিক প্রিয়তর হবে। এই একনিষ্ঠ ইলমের জন্য সে নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে করবে, ইবাদত-বন্দেগীতে পরিশ্রমী হবে, আল্লাহ্কে আরো বেশী ভয় পাবে, তাঁর প্রতি আরও বেশী আগ্রহী হবে এবং মানুষের মাঝে সে হবে সবচেয়ে বিনয়ী প্রকৃতির'।[৩০]

ইউসুফ ইবনে হুসাইন (রহঃ) বলেন, فِي الدُّنْيَا طُغْيَانَانِ: طُغْيَانُ الْعِلْمِ وَطُغْيَانُ الْمَالِ، وَالَّذِي يُنْجِيكَ مِنْ طُغْيَانِ الْعِلْمِ الْعِبَادَةُ، وَالَّذِي يُنْجِيكَ مِنْ طُغْيَانِ الْمَال الزُّهْدُ فِيهِ، 'দুনিয়াতে দুই ধরনের বাড়াবাড়ি রয়েছে- (১) জ্ঞানের বাড়াবাড়ি এবং (২) সম্পদের বাড়াবাড়ি। ইবাদত তোমাকে ইলমের বাড়াবাড়ি থেকে রক্ষা করবে। আর দুনিয়া বিমুখতা তোমাকে সম্পদের বাড়াবাড়ি থেকে মুক্তি দিবে'।[৩১]

২৯. *ইবনু হাম্বল, আয-যুহদ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১ম মুদ্রণ, ১৪২০হি./১৯৯৯খৃ.), পৃ. ২৬২; তারীখু দিমাশক্ব, ৫৬/৪৩৩।*
৩০. *বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, ৩/২৮২।*

৫. আমলের মাধ্যমে উপকারী ইলমের পথ উন্মোচিত হয় :

উপকারী জ্ঞান বান্দার জন্য নতুন জ্ঞানের দরজা খুলে দেয়। কারণ যদি কেউ কোন কিছু শিখে তা বাস্তবে পালন করতে থাকে, তখন আল্লাহ তার অন্তরে আরও গভীর জ্ঞান ও হেকমত দান করেন। উদাহরণস্বরূপ কেউ ছালাতের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনে তা নিয়মিত আদায় শুরু করল। কিছুদিন পর সে ছালাতের মধ্যে খুশূ'-খুযূ' অর্জনের চেষ্টা করবে, আয়াতের অর্থ বুঝতে চাইবে, সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত ও তাজবীদ শিখতে আগ্রহী হবে। এভাবে তার আমলই তাকে নতুন নতুন ইলমের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি রিযিকের হালাল-হারাম বিষয়ে জেনে তা মেনে চলতে শুরু করে। কিছুদিন পর তার মনে প্রশ্ন জাগবে, আর কোন কোন লেনদেন হারাম? তখন সে ফিক্বহ শিখতে আগ্রহী হবে। অতএব ইলম শুধু মুখস্থ করার জন্য নয়; বরং যখন তা আমলে পরিণত হয়, তখন আল্লাহ তার মাধ্যমে উপকারী জ্ঞানের নতুন নতুন দরজা খুলে দেন। আল্লাহ বলেছেন, وَالَّذِينَ جَاهَدُوْا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ، 'আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, তাদেরকে আমরা আমাদের পথ সমূহের দিকে পরিচালিত করব। বস্তুতঃ আল্লাহ অবশ্যই সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*।

অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ بِمَا يَعْلَمُوْنَ نَهْدِيْهِمْ إِلَى مَا لَا يَعْلَمُوْنَ، 'যারা অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, আমি তাদের অজানা বিষয়গুলো সম্পর্কে পথ দেখাবো'।[৩২] ফুযাইল ইবনে ইয়ায (রহঃ) বলেন, مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، اسْتَغْنَى عَمَّا لاَ يَعْلَمُ، وَمَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، وَفَّقَهُ اللهُ لِمَا لاَ يَعْلَمُ، 'কোন ব্যক্তি জ্ঞান অনুযায়ী আমল করে, সে অজানা বিষয় থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে যাবে। আর যে ইলম অনুযায়ী আমল করে, তার অজানা বিষয় জানার জন্য আল্লাহ তাকে তাওফীক্ব দান করেন'।[৩৩]

আবু আব্দুল্লাহ রুযবারী (মৃ. ৩৬৯ হি.) বলেন, الْعِلْمُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْعَمَلِ بِهِ، وَالْعَمَلُ مَوْقُوفٌ عَلَى الْإِخْلَاصِ، وَالْإِخْلَاصُ لِلَّهِ يُورِثُ الْفَهْمَ عَنِ اللهِ عز وجل، 'ইলম নির্ভরশীল সে অনুযায়ী আমল করার উপর। আর আমল নির্ভরশীল ইখলাছের উপর। আর আল্লাহ্র জন্য ইখলাছ মানুষকে তাঁর পক্ষ থেকে গভীর প্রজ্ঞা দান করে'।[৩৪]

৩১. *তারীখু দিমাশক্ব ৭৪/২২৭; হিলয়াতুল আওলিয়া ১০/২৩৯।*
৩২. *ইক্বতিযাউল ইলমিল আমাল, পৃ. ৩০।*
৩৩. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/৩৯৬।*
৩৪. *খত্বীব বাগদাদী, আয-যুহদু ওয়ার রাক্বায়েক্ব, পৃ. ৭১; তারীখু বাগদাদ ৫/৯৮।*

মাত্বার ইবনে ত্বাহমান আল-ওয়াররাক্ব (মৃ. ২২৯ হি.) বলেন, خَيْرُ الْعِلْمِ مَا نَفَعَ وَإِنَّمَا يَنْفَعُ اللهُ بِالْعِلْمِ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ عَمِلَ بِهِ، وَلَا يَنْفَعُ بِهِ مَنْ عَلِمَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ، 'শ্রেষ্ঠ ইলম সেটাই যা (তার বাহককে) উপকৃত করে। যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে এবং তা আমলে পরিণত করে, আল্লাহ তাকে তার ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করেন। আর যে ব্যক্তি ইলম অর্জন করে আমল পরিত্যাগ করে, আল্লাহ তাকে তার ইলমের মাধ্যমে উপকৃত করেন না'।[৩৫]

৬. দুনিয়া আমলের জায়গা :

দুনিয়া আসলে আমল করার জায়গা। আর আখেরাত হ'ল আমলের ফল ভোগ করার জায়গা। তাই ইলম অর্জনের পর তা বাস্তবে প্রয়োগ করাই মূল উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন, وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، 'আর তুমি বল, তোমরা কাজ করে যাও। অচিরেই তোমাদের কাজ দেখবেন আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও ঈমানদারগণ। আর সত্বর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই সত্তার নিকটে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবহিত করবেন' *(তওবা ৯/১০৫)*।

আল্লামা আব্দুর রহমান আস-সা'দী (রহঃ) বলেন, 'এ আয়াতে রয়েছে কঠোর ভয় প্রদর্শন ও কঠিন সতর্কবাণী তাদের জন্য, যারা নিজেদের মিথ্যা, অবাধ্যতা, পথভ্রষ্টতা ও পাপাচারে অবিচল থাকে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হ'ল তোমরা ভালো কিংবা মন্দ যে কাজই কর না কেন, আল্লাহ তা অবগত আছেন। আর আল্লাহ তাঁর রাসূল ও ঈমানদার বান্দাদেরও তোমাদের কাজ সম্পর্কে অবহিত করবেন, যদিও তা গোপনেই সম্পাদিত হয়ে থাকে'।[৩৬]

অতএব আল্লাহ্র ইবাদতের ফযীলত ও তাঁর অবাধ্যতার ভয়াবহতা জেনে সেই অনুযায়ী আমল না করা তেমনি নিস্ফল যেমন জমিতে বীজ বপন না করেই ফসলের আশা করা নিরর্থক। উদাহরণত কেউ যদি জানে যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ফরয, তা জামা'আতের সাথে আদয় করা অপরিহার্য, কিন্তু সময়মতো ছালাত আদায় করে না, জামা'আতে ছালাতের ব্যাপারে গাফলতি করে, তাহ'লে তার ইলম তার কোন উপকারে আসবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি অল্প জানে, কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করে, তবে সে-ই সফলতার মনযিলে পৌঁছে যাবে। এজন্য ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীন ইলম শিখে তাৎক্ষণিকভাবে তা জীবনে বাস্তবায়ন করতেন, যেন আখেরাতে এর ফল লাভ করা যায়।

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلَّم عَشْرَ آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهنَّ، والعملَ بهِنَّ، 'আমাদের মধ্যকার কোন ব্যক্তি যখন দশটি আয়াত শিখতেন, তখন সেই আয়াতগুলো অতিক্রম করতেন না যতক্ষণ না এগুলোর অর্থ জানতেন এবং আমল করতেন'।[৩৭] ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, الْمَطْلُوبُ مِنْ الْقُرْآنِ هُوَ فَهْمُ مَعَانِيهِ، وَالْعَمَلُ بِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ هِمَّةَ حَافِظِهِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالدِّينِ، 'কুরআন পাঠের মূল উদ্দেশ্য হ'ল এর অর্থ অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করা। কুরআনের বাহকের যদি এই অভিপ্রায় না থাকে, তবে সে আলেম ও দ্বীনদারদের অন্তর্ভুক্ত হবে না'।[৩৮]

সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন, مَا بَلَغَنِي عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثٌ قَطُّ، إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন হাদীছ যখনই আমার কাছে পৌঁছেছে, আমি জীবনে একবার হ'লেও তার উপর আমল করেছি'।[৩৯]

৭. ক্বিয়ামতের দিন বান্দা এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে :

বান্দা স্বীয় অর্জিত জ্ঞান অনুযায়ী আমল করেছে কি-না সে ব্যাপারে আল্লাহ্র নিকটে জিজ্ঞাসিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ، عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ 'ক্বিয়ামতের দিন আদম সন্তানের পা তার রবের কাছ থেকে একটুও নড়াতে পারবে না, যতক্ষণ না তাকে পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে : (১) তার জীবনকাল সম্পর্কে, তা কোন পথে অতিবাহিত করেছে, (২) তার যৌবনকাল সম্পর্কে, কি কাজে তা বিনাশ করেছে, (৩) তার ধন-সম্পদ সম্পর্কে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে, (৪) আর তা কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছিল সে অনুযায়ী কী আমল করেছে'।[৪০] এখানে হাশরের মাঠের ভীতিকর জবাবদিহিতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। পঞ্চম পয়েন্টের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জ্ঞান কেবল স্মৃতিতে ধরে রাখা এবং বইপত্রে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য নয়; বরং তা মানুষের জীবনে পরিবর্তন আনার জন্য, নিজের আমলকে সংশোধন করার জন্য এবং অন্যকে সৎপথে আহ্বানের জন্য। একজন মানুষ যদি আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানে, কিন্তু নিজের জীবনকে সেই অনুযায়ী গড়ে না

---

৩৫. ইক্বতিযাউল ইলমিল আমাল, পৃ. ৩৩।
৩৬. তাফসীরে সা'দী, পৃ. ৩৫১।
৩৭. তাফসীরে ত্বাবারী, ১/৮০।
৩৮. ইবনে তাইমিয়াহ, আল-ফাতাওয়াল কুবরা (বৈরূত : দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, ১৪০৮হি./১৯৮৭খৃ.), ২/১৩৫।
৩৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৭/২৪২।
৪০. তিরমিযী হা/২৪১৬; মিশকাত হা/৫১৯৭; সনদ হাসান।

তোলে, তবে সে জ্ঞান অর্জন করেও ব্যর্থ হয়েছে। অনেকে হারাম-হালালের বিধান জানে, কিন্তু ব্যবসায় মুনাফার লোভে সূদে জড়িয়ে পড়ে; আবার কেউ ইসলামে গীবত নিষিদ্ধ জেনেও প্রতিদিন আড্ডায় গীবত করে সময় কাটায়। এমন আচরণ মূলত জ্ঞানের অপমান এবং ক্বিয়ামতের দিন ভয়াবহ অবস্থার কারণ হবে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় অজ্ঞতা এবং পরকালের কঠিন জবাবদিহিতার সম্মুখীন হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

৮. জান্নাত লাভের মাধ্যম :

ইসলামে জ্ঞানকে উদ্দেশ্য হিসাবে নয়, বরং সঠিক আমলের পথপ্রদর্শক হিসাবে দেখা হয়। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক বেদুঈন লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে বলল, يَا رَسُولَ اللهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، ‘হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাকে এমন একটি আমলের সন্ধান দিন, যা করলে আমি জান্নাতে যেতে পারব। তিনি বললেন, تَعْبُدُ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، ‘আল্লাহ্‌র ইবাদাত করবে, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, ফরয ছালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত প্রদান করবে এবং রামাযানের ছিয়াম পালন করবে। এ কথা শুনে লোকটি বলল, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا أَبَدًا، وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ، ‘ঐ সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন রয়েছে! আমি এর থেকে বেশীও করব না, কমও করব না’। এ কথা বলে লোকটি যখন চলে যাচ্ছিল, তখন নবী করীম (ছাঃ) তার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا، ‘যে ব্যক্তি জান্নাতী কোন লোককে দেখে আনন্দিত হ’তে চায়, সে যেন এ লোককে দেখে’।[৪১]

অত্র হাদীছে একটি বড় শিক্ষা রয়েছে। সেটা হ’ল সত্যিকারের সফলতা শুধু জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে লাভ করা যায় না, বরং সেই জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল আমলের মাধ্যমে লাভ করা যায়। এই বেদুঈন লোকটি অল্প কিছু জ্ঞান পেয়েছে, কিন্তু সেটাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে ও বাস্তবায়নের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছে। আর এই খুলূছিয়াত ও দৃঢ়তার জন্যই তার ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। আমাদের সবার হৃদয়ে যদি সেই বেদুঈনের মতো দৃঢ় সংকল্পের স্ফুরণ ঘটে, তবে এই নব্য জাহেলিয়াতের পরিবেশে পুনরায় ঈমানী বাতাস প্রবাহিত হবে। তাক্বওয়া ও বরকতের ধারায় সিক্ত এক সুন্দর সমাজ গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ।

উপসংহার :

ইলম ও আমল হ’ল দ্বীনের দু’টি শক্তিশালী বুনিয়াদ। একজন মুমিনের সাফল্য এ দু’টি স্তম্ভের উপরেই দণ্ডায়মান। অর্জিত জ্ঞান মানচিত্রের মতো, যা সঠিক পথ দেখায়। আর আমল ও ইবাদত-বন্দেগী হ’ল সেই মানচিত্রের পথ ধরে গন্তব্যের দিকে যাত্রা করার ন্যায়। মানুষ মানচিত্র হাতে রেখেও যাত্রা শুরু না করলে সে কখনো গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে না। আবার কেউ যদি মানচিত্র ছাড়া যাত্রা শুরু করে তবে সে পথ হারিয়ে ফেলবে। সেজন্য বাস্তব জীবনে ইলম ও আমলের সমন্বয় ঘটানো অপরিহার্য। বর্তমান মুসলিম উম্মাহ যদি তাদের হারানো মর্যাদা ফিরে পেতে চায়, আধ্যাত্মিক ও ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান হ’তে চায়, তবে এটিই তাদের জন্য প্রধান উপায়। মহান আল্লাহ্‌র দরবারে আকুল প্রার্থনা তিনি যেন আমাদেরকে এমন উপকারী ইলম হাছিলের তাওফীক্ব দেন, যা আমাদের হৃদয়ে ঈমানের নূর পয়দা করে এবং জীবনকে সুশোভিত করে। আর সেই অর্জিত জ্ঞানের আলোকে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত-বন্দেগী ও দাসত্ব করার তাওফীক্ব দান করেন। আমারা যেন জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে জান্নাতের পথে যাত্রা করতে পারি, মহান রব আমাদেরকে সেই খোশ নছীব দান করুন- আমীন!

৪১. বুখারী হা/১৩৯৭; মুসলিম হা/১৪; মিশকাত হা/১৫।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন

সোনামণি প্রতিভা

(একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর’১২ হ’তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **‘সোনামণি’**-এর মুখপত্র **‘সোনামণি প্রতিভা’**।

লেখা আহ্বান

মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **‘সোনামণি প্রতিভা’**র জন্য উক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিয়মিত বিভাগ সমূহ :

বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, হাদীছের গল্প এসো দো‘আ শিখি, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ইত্যাদি।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা) নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭।

ঈদে মীলাদুন্নবী

-আত-তাহরীক ডেস্ক

সংজ্ঞা : ‘জন্মের সময়কাল’কে আরবীতে ‘মীলাদ’ বা ‘মাওলিদ’ বলা হয়। সে হিসাবে ‘মীলাদুন্নবী’-র অর্থ দাঁড়ায় ‘নবীর জন্ম মুহূর্ত’। নবীর জন্মের বিবরণ, কিছু ওয়ায ও নবীর রূহের আগমন কল্পনা করে তার সম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে ‘ইয়া নবী সালাম ‘আলায়কা’ বলা ও সবশেষে জিলাপী বিতরণ করা- এই সব মিলিয়ে ‘মীলাদ মাহফিল’ ইসলাম প্রবর্তিত ‘ঈদুল ফিতর’ ও ‘ঈদুল আযহা’-র দু’টি বার্ষিক ঈদ উৎসবের বাইরে ‘ঈদে মীলাদুন্নবী’ নামে তৃতীয় আরেকটি ধর্মীয় (?) অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

উৎপত্তি : ক্রুসেড বিজেতা মিসরের সুলতান ছালাহুদ্দীন আইয়ূবী (৫৩২-৫৮৯ হি.) কর্তৃক নিযুক্ত ইরাকের ‘এরবল’ এলাকার গভর্ণর আবু সাঈদ মুযাফফরুদ্দীন কুকুবুরী (৫৮৬-৬৩০ হি.) সর্বপ্রথম ৬০৪ হিজরীতে মতান্তরে ৬২৫ হিজরীতে মীলাদের প্রচলন ঘটান। যা ছিল রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫৯৩ বা ৬১৪ বছর পরে। এই দিন তারা মীলাদুন্নবী উদযাপনের নামে নাচ-গান সহ চরম স্বেচ্ছাচারিতায় লিপ্ত হ’ত। গভর্ণর নিজে নাচে অংশ নিতেন। আর এই অনুষ্ঠানের সমর্থনে তৎকালীন আলেম সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন আবুল খাত্ত্বাব ওমর বিন দেহিইয়াহ (৫৪৪-৬৩৩ হি.)। তিনি মীলাদের সমর্থনে বহু জাল ও বানাওয়াট হাদীছ জমা করে বই লেখেন এবং এক হাযার স্বর্ণমুদ্রা বখশিশ পান।[১]

হুকুম : ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন একটি সুস্পষ্ট বিদ‘আত। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে ছিল না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ أَحْدَثَ فِى أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ‘যে ব্যক্তি আমাদের শরী‘আতে এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত’।[২] তিনি আরও বলেন, وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ، ‘তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সৃষ্টি করা হ’তে বিরত থাক। নিশ্চয়ই প্রত্যেক নতুন সৃষ্টিই বিদ‘আত ও প্রত্যেক বিদ‘আতই গোমরাহী’।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِى النَّارِ، ‘এবং প্রত্যেক গোমরাহীর পরিণাম জাহান্নাম’।[৪]

মীলাদ বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে চার মাযহাবের ঐক্যমত : ‘আল-ক্বাওলুল মু‘তামাদ’ গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চার মাযহাবের সেরা বিদ্বানগণ সর্বসম্মতভাবে প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান বিদ‘আত হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছেন। তাঁরা বলেন, এরবলের গভর্ণর কুকুবুরী এই বিদ‘আতের হোতা। তিনি তার আমলের আলেমদেরকে মীলাদের পক্ষে মিথ্যা হাদীছ তৈরী করার ও ভিত্তিহীন ক্বিয়াস করার হুকুম জারী করেছিলেন।[৫]

১. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (দারুল ফিকর, ১৯৮৬) পৃ. ১৩/১৩৭।
২. মুসলিম হা/১৭১৮; বুখারী হা/২৬৯৭; মিশকাত হা/১৪০।
৩. আবূদাঊদ হা/৪৬০৭; তিরমিযী হা/২৬৭৬; মিশকাত হা/১৬৫।
৪. নাসাঈ হা/১৫৭৮ ‘কিভাবে খুৎবা দিবে’ অনুচ্ছেদ।
৫. মীলাদুন্নবী ৩৫ পৃ.; ইবনু তায়মিয়াহ, ইক্বতিযাউছ ছিরাত্বিল মুস্তাক্বীম (১ম সংস্করণ : ১৪০৪ হি./১৯৮৪ খৃ.) ৫১ পৃ.।

রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম-মৃত্যুর সঠিক তারিখ : জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব মতে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সঠিক জন্মদিবস হয় ৯ই রবীউল আউয়াল সোমবার। ১লা রবীউল আউয়াল সোমবার তাঁর মৃত্যুদিবস।[৬] অথচ ১২ই রবীউল আউয়াল তাঁর জন্মবার্ষিকী বা ‘মীলাদুন্নবী’র অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।

ক্বিয়াম প্রথা : সপ্তম শতাব্দী হিজরীতে মীলাদ প্রথা চালু হওয়ার প্রায় এক শতাব্দীকাল পরে আল্লামা তাক্বিউদ্দীন সুবকী (৬৮৩-৭৫৬ হি.) কর্তৃক ক্বিয়াম প্রথার প্রচলন ঘটে বলে কথিত আছে।[৭] তবে এর সঠিক তারিখ ও আবিষ্কর্তার নাম জানা যায় না।[৮]

ক্বিয়ামী মীলাদকারীদের যুক্তি হ’ল, তারা রাসূল (ছাঃ)-এর ‘সম্মানে’ উঠে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাদের ধারণা যে, মীলাদের মাহফিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রূহ মুবারক হাযির হয়ে থাকে। এই ধারণা সর্বসম্মতভাবে কুফরী।[৯] ‘তুহফাতুল কুযাত’ কিতাবে এই ধারণাকে স্পষ্ট শিরক বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় জীবদ্দশায় তাঁর সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর ধমকি প্রদান করেছেন।[১০] অথচ মৃত্যুর পর তাঁরই কাল্পনিক রূহের সম্মানে দাঁড়ানোর উদ্ভট যুক্তি ধোপে টেকে কি? আর একই সাথে লাখো মীলাদের মজলিসে হাযির হওয়া কারু পক্ষে সম্ভব কি?

অতএব এগুলির বিরুদ্ধে সাধ্যমত প্রচার করুন এবং এগুলি থেকে চোখ-কান বন্ধ রাখুন ও পরিবারকে রক্ষা করুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!

৬. সীরাতুর রাসূল (ছাঃ), ৩য় মুদ্রণ ৫৬ পৃ.।
৭. আবু ছাঈদ মোহাম্মাদ, মিলাদ মাহফিল (ঢাকা ১৯৬৬), ১৭ পৃ.।
৮. তাজুদ্দীন সুবকী, তাবাক্বাতু শাফেঈয়াহ কুবরা (বৈরূত : দারুল মা‘রিফাহ, তাবি, ১৩২২ হি. ছাপা হ’তে ফটোকৃত) ৬/১৭৪।
৯. মুহাম্মাদ জুনাগড়ী, (মউ, ইউ পি ১৯৬৭) মীলাদে মুহাম্মাদী ২৫, ২৯ পৃ.।
১০. তিরমিযী হা/২৭৫৫; আবূদাঊদ হা/৫২২৯; মিশকাত হা/৪৬৯৯ ‘আদব’ অধ্যায়।

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

নরমাল ডেলিভারী ও বন্ধ্যাত্ব রোগে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

এম.বি.বি.এস, এম.এস, (অবস-গাইনী)
বি.সি.এস (স্বাস্থ্য)
CMU (Special Training on TVS)
স্ত্রী রোগ, প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
বি.এম.ডি.সি রেজি: নং এ-৪৯৩১৫
রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল : ০১৭৬৭-৪২৪৬৪৬

যে সকল রোগের চিকিৎসা করা হয়

- Normal Delivery (সিজার ছাড়াই বাচ্চা হওয়া)-তে প্রাধান্য (রোগীর স্বাস্থ্যের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা)।
- গর্ভধারণকালীন মায়ের বিভিন্ন জটিলতা নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- বাচ্চা না হওয়ার (বন্ধ্যাত্ব/ইনফার্টিলিটি) কারণ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদান।
- ডিম্বাশয়ের সিস্ট-টিউমার এবং জরায়ু নালী চিকন/বন্ধ হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা করা হয় এবং প্রয়োজনে অপারেশন করা হয়।
- লাইগেশন (Ligation) করার পর পুনরায় বাচ্চা নেওয়ার অপারেশন।

চেম্বার
ল্যাবএইড লিঃ (ডায়াগনস্টিকস)
বাড়ী নং ৬২১, শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
রোগী দেখার সময় : দুপুর ৩ টা - রাত্রি ৯ টা
সিরিয়ালের জন্য : ০১৩০৮-৬৩৫৫৭২

শরণার্থীদের জীবন : অবরুদ্ধ মানুষের করুণ আর্তনাদ

-আত-তাহরীক ডেস্ক

একবিংশ শতাব্দীর এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে যখন মানুষ এক নতুন বিশ্বের স্বপ্ন দেখছে, চলছে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসাসহ মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের সাড়ম্বর আয়োজন, ঠিক তখনই পৃথিবীর কোণে কোণে মানবতা যেন কাঁদছে নীরবে। এই নীরব কান্নার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা কোটি কোটি শরণার্থীর ক্লান্ত-বিধ্বস্ত অশ্রুসজল চোখে ও তামাটে বিদীর্ণ চেহারায়। জাতিগত সংঘাত, রাজনৈতিক নিপীড়ন আর সীমাহীন ঘৃণার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে একদল মানুষের সাজানো ঘর, স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎ। নিজ মাতৃভূমিতে পরবাসী এই মানুষগুলোর হাহাকার আজ আকাশ-বাতাসকে ভারী করে তুলেছে, কিন্তু সেই আর্তনাদ কি পৌঁছায় ক্ষমতার কেন্দ্রে বসে থাকা বধির কর্ণধারদের কাছে?

সারা বিশ্বে বর্তমানে ১২ কোটি মানুষ বাস্তুচ্যুত ও ছিন্নমূল। অসম যুদ্ধ, নানারূপ স্বার্থের সংঘাত, সংঘর্ষ, সহিংসতা, জীবনভীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন কিংবা আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ার কারণে এসব মানুষ তাদের ভিটেমাটি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে। এই ১২ কোটি মানুষের মধ্যে ৪ কোটি মানুষ অন্য দেশে শরণার্থী। বাকী ৭ কোটি মানুষ নিজ দেশেই অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত। অন্যান্য ৮০ লাখ মানুষ রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী। ৪০ লাখ মানুষের কোন দেশই নেই। সব হারিয়ে তারা আজ সর্বস্বান্ত।

এই নির্মম বাস্তবতার সবচেয়ে যন্ত্রণাদায়ক ও বিভীষিকাময় অধ্যায়টি এখন লেখা হচ্ছে ফিলিস্তীনের গাযা উপত্যকায়। গাযা আজ কেবল একটি ভৌগোলিক সীমারেখা নয়, এটি এখন এক অবরুদ্ধ মৃত্যুপুরী, যেখানে জীবন নিয়ে বেঁচে থাকাটাই এক অলৌকিক রহস্য। অবিরাম বোমাবর্ষণে আকাশ থেকে প্রতিনিয়ত ঝরে পড়ছে আগুনের ফুলকি, দ্রিম দ্রিম শব্দে কাঁপছে যমীন, আর বাতাসে ভাসছে স্বজন হারানোর বুকফাটা আর্তনাদ। একসময়কার প্রাণচঞ্চল শহরগুলো আজ যেন ভয়ংকর ভূমিকম্পের দৃশ্যপট। চারিদিকে কংক্রিটের ধ্বংসস্তূপ। এই ধ্বংসস্তূপের নীচে শুধু ঘরবাড়ি নয়, চাপা পড়েছে লক্ষ লক্ষ শিশুর রঙিন স্বপ্ন। এখানকার তেইশ লক্ষ মানুষের প্রায় সকলেই আজ গৃহহীন, নিজ দেশে শরণার্থী। এক মুঠো খাবার বা এক ফোঁটা বিশুদ্ধ পানির জন্য তাদের আকুতি সভ্যতার গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত। আশ্রয়কেন্দ্রের অপরিসর তাঁবুতে গাদাগাদি করে বেঁচে থাকার এই লড়াইয়ে প্রতি মুহূর্তে সঙ্গী হয় ক্ষুধা, রোগ আর প্রিয়জনকে হারানোর ভয়।

কে জানত, যে মানুষটি গতকালও শত শত শ্রমিকের কর্মসংস্থান করতেন, যার বাড়ি আর ব্যবসার খ্যাতি ছিল শহরজুড়ে, মেডিকেল ডাক্তার, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক কিংবা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যিনি ছিলেন প্রথিতযশা, আজ তিনিই এক টুকরো রুটির জন্য অন্যের দয়ার পাত্র হবেন? চাপানো যুদ্ধের নিষ্ঠুরতা এমনই যে, এটি শুধু মাযলূম মানুষের প্রাণই কেড়ে নেয় না, কেড়ে নেয় তার আত্মমর্যাদা, তার পরিচিতি। গাযায় এমন হাযারো গল্প ছড়িয়ে আছে, যেখানে সচ্ছলতার চূড়া থেকে মানুষ রাতারাতি নেমে এসেছে নিঃস্বতার অতল গহ্বরে। চিকিৎসাব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় আহতদের বিনা অ্যানেস্থেসিয়ায় অস্ত্রোপচার করতে হচ্ছে; এই দৃশ্য কল্পনা করলেও শরীর শিউরে ওঠে।

গাযার এই ধ্বংসস্তূপ কেবল একটি উষর মরুভূখণ্ডের নয়, বরং এটি বিশ্altবিবেকের সমাধিক্ষেত্র, যা তারা ঠাণ্ডা মাথায় নিষ্ঠুরভাবে নিজ হাতেই নির্মাণ করেছে। তবে এই সমাধির শিলালিপি লেখা হয়েছে বিশ্বের আরও অনেক প্রান্তে। বাংলাদেশের কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া মিয়ানমার থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কথাই ধরা যাক। নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ হয়ে তারা আজ এক রাষ্ট্রহীন জাতি, যাদের ভবিষ্যৎ এক অন্তহীন অনিশ্চয়তায় ঢাকা। পাহাড়ের গাত্রদেশে ঝুলে আছে তাদের স্বপ্নের ছিন্নপত্র আর শুকনো ডালপালারা। একইভাবে সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ থেকে পালিয়ে বাঁচা লক্ষ লক্ষ মানুষ ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী শিবিরে দিনাতিপাত করছে, যেখানে বঞ্চনা ও দৈন্যদশাই তাদের নিয়তি। সুদানের মতো আফ্রিকার বহু দেশে অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার লড়াইয়ের আগুনে পুড়ে সর্বস্বান্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ। এই সব শরণার্থীর দুঃখের গল্প ভিন্ন হ'লেও তাদের সবার হৃদয়ের ভাষা এক। তা হ'ল নিজ ঘরে ফেরার পরম আকুতি এবং শান্তিতে দু'দণ্ড বেঁচে থাকার একটি ন্যূনতম দাবী।

গত প্রায় দুই বৎসর ধরে ফিলিস্তীনের গাযা ভূখণ্ড এক ভয়াবহ মৃত্যুপুরীতে রূপ নিয়েছে। একদিকে আকাশ থেকে টনকে টন বোমা নিক্ষেপ করে ধ্বংস করা হচ্ছে ঘরবাড়ী, স্কুল, হাসপাতাল, অন্যদিকে মাটিতে জমেছে ক্ষুধার্ত মানুষের নিথর দেহ। যুদ্ধের ভয়াল রূপ শুধু গোলা বারুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তার চেয়ে নীরব-নিষ্ঠুর এক অস্ত্র হয়ে ওঠেছে ক্ষুধা। যার সামনে অর্থহীন পৃথিবীর সবকিছু। গুলী-বোমার ভয় তুচ্ছ করে অবরুদ্ধ গাযাবাসীর লড়াই এখন ক্ষুধার যন্ত্রণার সাথে। নিষ্পাপ শিশুদের একেকটি চোখ যেন অনাহারের অথৈ সমুদ্র। শরণার্থী ক্যাম্পগুলোতে ত্রাণের জন্য লাইনে দাঁড়ানো নিরস্ত্র মানুষজন, যারা শুধু একমুঠো খাবারের আকুতি জানাচ্ছে, তাদেরকে লক্ষ্য করেই নির্বিচারে গুলী চালানো হচ্ছে। এসব মানুষের অপরাধ একটাই তারা গাযায় জন্মেছে এবং বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।

গাযায় যখন প্রতিদিন মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে, তখন সেখানে মানবিক সহায়তা পৌছানোর নামে চালু হয়েছে আরেক ফাঁদ। গঠন করা হয়েছে একটি নতুন সংগঠন 'গাযা হিউম্যানিটেরিয়ান ফাউণ্ডেশন' (জিএইচএফ)। গাযায় জিএইচএফ ছাড়া কাউকে ইস্রাঈল ত্রাণ বিতরণের সুযোগ দেয় না। বিশেষজ্ঞদের মতে এই জিএইচএফ হ'ল ইস্রাঈল ও

যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনে গড়ে ওঠা একটি প্রতারণামূলক উদ্যোগ। জিএইচএফ তৈরি করা হয়েছে ত্রাণ সহায়তার নাটক করার জন্য, গাযাবাসীকে বাঁচানোর জন্য নয়। এমনভাবে এর কার্যক্রম চালানো হয় যেন আন্তর্জাতিক মহলের চোখে মনে হয় ইস্রাঈল ত্রাণ দিয়ে সহায়তা করছে এবং মানবিক সহনশীলতা দেখাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে এই ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রগুলিই গাযাবাসীর মৃত্যুর নতুন ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোথা থেকে কখন গুলী আসবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বহু মানুষ এসব ত্রাণ কেন্দ্রের আশেপাশে গুলীবিদ্ধ হয়ে মারা গেছে। আমরা যেমন সামান্য খাবার দিয়ে ইঁদুর মারি ঠিক একইভাবে ইস্রাঈলী বাহিনী গাযায় জিএইচএফ-এর মাধ্যমে ত্রাণের লোভ দেখিয়ে ফিলিস্তীনীদের উপর চালাচ্ছে দীর্ঘ পরিকল্পিত নিধনযজ্ঞ।

শিশুদের অবস্থা আরো ভয়াবহ। তাদের হাড্ডিসার দেহগুলোর দিকে তাকনোর কোন উপায় নেই। যেন জীবন্ত কঙ্কাল। ক্ষুধার তাড়নায় গাযার শিশুদের কান্না করার শক্তিটুকুও নেই। মায়েদের চোখের পানিও প্রায় শুকিয়ে গেছে। পৃথিবীতে মানুষ যতভাবে মারা যায় তার মধ্যে ক্ষুধার যন্ত্রণায় মারা যাওয়া সবচেয়ে কঠিন। জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক কমিশন ইউনিসেফ জানিয়েছে বিপর্যয়ের পর্যায়ে পৌঁছেছে গাযার শিশুদের অপুষ্টির মাত্রা। গত জুনে যেখানে হাসপাতালে ভর্তি হয় সাড়ে ৬ হাযার শিশু, সেখানে জুলাইয়ের প্রথম দুই সপ্তাহে ভর্তি হয় ৫ হাযার শিশু। বর্তমানে প্রতিদিন অপুষ্টির শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে সাড়ে তিন শতাধিক শিশু। গত কয়েক মাসে শত শত শিশু অপুষ্টিজনিত রোগে মারা গেছে। অনেকে ত্রাণের জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার আনতে গিয়ে গুলীতে নিহত হয়েছে।

শত শত লরি ভর্তি খাদ্য খাবার সীমান্তের বাইরে অপেক্ষা করলেও এগুলো প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। আবার ইস্রাঈলী পাষণ্ডরা অনেক খাবার নষ্টও করে দিচ্ছে। বিশ্বখ্যাত দুর্ভিক্ষ বিশেষজ্ঞ অ্যালেক্স ডি ওয়াল একে বলেছেন, Famine by Design অর্থাৎ পূর্ব পরিকল্পিত দুর্ভিক্ষ। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে খাদ্যপ্রবাহ বন্ধ করে একটি জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করা হচ্ছে। আর এই ধ্বংসযজ্ঞের ইন্ধন যোগাচ্ছে পশ্চিমা গণমাধ্যম ও পশ্চিমা রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা। ইস্রাঈল গাযায় ইচ্ছাকৃতভাবে ফিলিস্তীনীদের অনাহারে রাখছে বলে অভিযোগ করেছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল'। জাতিসংঘের জ্যেষ্ঠ মানবিক কর্মকর্তা রমেশ বলেছেন, 'এটি আর ভবিষ্যতের দুর্ভিক্ষের ঝুঁকি নয়, এটি সরাসরি অনাহারে মানুষ মেরে ফেলা'। অ্যালেক্স ডি ওয়াল জানান, 'গাযার হাযারো শিশু এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে তারা খাবার পেলেও খেতে পারবে না। তাঁর ভাষায়, তাদের শরীর এখন আর খাবার হজম করতে সক্ষম নয়'। খোদ ইস্রাঈলী মানবাধিকার সংস্থা 'ফিজিসিয়ান ফর হিউম্যান রাইট' বলেছে, 'এটি যুদ্ধ নয় এটি একটি জাতিকে ধ্বংস করার ধারাবাহিক পরিকল্পনা'।

শরণার্থীদের অধিকার রক্ষা করা জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল দায়িত্ব হ'লেও এর বাস্তবায়নে যথেষ্ট ঘাটতি লক্ষ্য করা যায়। অনেক ক্ষেত্রেই শরণার্থীদের মৌলিক অধিকার যেমন- স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। শিশুরা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নারীরা যৌন হয়রানি এবং নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হচ্ছে। যা মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন।

বিশ্ব মানবাধিকার সনদ অনুযায়ী, প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার এবং নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চার অধিকার আছে। কিন্তু শরণার্থীদের ক্ষেত্রে এগুলো বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। এ অবস্থায় তাদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। বিশেষ করে শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক সংকট তীব্র আকার ধারণ করছে।

এই ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়গুলো দেখে দেখে আমরা এতটাই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি যে, তাদের ব্যাপারে বিবেক আমাদের প্রায় রুদ্ধ। বিশ্ব মানবতার চোখের সামনে সবকিছু ঘটে চলেছে, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের দৃষ্টি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় না। টিভি নিউজের মত খবরগুলো স্ক্রল করে এগিয়ে যাই পরবর্তী খবরের জন্য। ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর দ্বিমুখী নীতি, গভীর নীরবতা এবং ক্ষেত্রবিশেষে আগ্রাসনে উসকানি এই সংকটগুলোকে আরও ঘনীভূত করে তোলে। জাতিসংঘ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একটা জলজপ্রাণী তিমিরের মৃত্যুতে শোরগোল তুললেও, হাযার হাযার মানুষের নিষ্করুণ মৃত্যুদৃশ্যে যেন আজ অসহায় নির্বাক দর্শক। অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বের ফাঁপা বুলি আর বিবৃতিসর্বস্ব কূটনীতি মযলূমের রক্তক্ষরণ বন্ধ না করে কাটা ঘায়ে বরং নুনের ছিটা ছাড়া আর কী দিতে পেরেছে। এভাবে সকল জাগতিক প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হয়, তখন অসহায় মানুষ আকাশের মালিকের দিকেই ফিরে তাকায়। আমরাও সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র দরবারেই হাত তুলি। হে রাব্বুল 'আলামীন, হে পরম করুণাময়! আপনি পৃথিবীর সকল মযলূম ও নির্যাতিত মানুষের কষ্ট দেখছেন, আপনি গাযাসহ সারাবিশ্বের সকল শরণার্থীর উপর আপনার অপার রহমত বর্ষণ করুন। তাদের ভাঙা হৃদয়ে শান্তি দিন, তাদের ক্ষুধা নিবারণ করুন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন। হে আল্লাহ! আপনি যালেমদের হৃদয়কে নরম করে দিন অথবা তাদের যুলুমের অবসান ঘটান। পৃথিবীতে আপনার অসীম করুণায় শান্তি ফিরিয়ে আনুন।

এই শরণার্থী সংকট কেবল কিছু মানুষের দেশ হারানোর গল্প নয়, এ সংকট সমগ্র মানবতার অস্তিত্বের সংকট। একজন শরণার্থীর চোখের পানি মানে মানবতার পরাজয়। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই দায়িত্ব রয়েছে-নিজের অবস্থান থেকে সত্যের পক্ষে আওয়াজ তোলা, সাধ্যমত তাদের সাহায্যে এগিয়ে যাওয়া। অন্ততপক্ষে তাদের জন্য মন থেকে দো'আ করা। কারণ একটি প্রদীপ থেকেই যেমন হাযারো প্রদীপ জ্বলে ওঠে, তেমনি একজন মানুষের মানবিক জাগরণ থেকেই সমষ্টিগত বিবেক কখনও জেগে উঠতে পারে। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

ইসলামে নারীর কর্মসংস্থান : একটি পর্যালোচনা

-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

মানুষকে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করে তাদেরকে পুরুষ-নারী দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এই দুই শ্রেণীর কর্মকাণ্ড ও কর্মপন্থায় বেশ ব্যবধান ও বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। এ বৈচিত্র্য বিশ্ব ব্যবস্থার অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এই কর্মপন্থাগত ব্যবধান-বৈচিত্র্যের সীমানা প্রাচীরকে মিটিয়ে দেয়া হ'লে বিশ্বব্যবস্থায় নানা জটিলতা ও সমস্যা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ তা'আলা নারী-পুরুষকে যেভাবে স্বভাবগত এবং গঠনগত স্বাতন্ত্র্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তেমনিভাবে জাগতিক ও ধর্মীয় জীবনে তাদের কর্মপন্থা ও দায়-দায়িত্বও ভিন্নতর করে দিয়েছেন। এটা সৃষ্টির প্রতি মহামহিম স্রষ্টার অতিশয় দয়ার বহিঃপ্রকাশ।

নারীর প্রধানতম কর্তব্য হ'ল, সংসার পরিচালনা করা, পরিবারের সার্বিক দিক লক্ষ্য রাখা এবং তার সন্তানদের প্রতিপালন-পরিচর্যা করা। শিক্ষা-দীক্ষাসহ সার্বিকভাবে যোগ্য করে গড়ে তোলা। সেই সাথে তার স্বামীর সেবা-যত্ন করা।[১] এমনকি নারীরা বাড়িতে স্বামীর খেদমতের সাথে গৃহস্থালীর কাজগুলো করলে সে জিহাদের সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে।[২]

অন্যদিকে নারীর খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানসহ ব্যক্তিগত প্রয়োজন, সংসার পরিচালনা ও সন্তান-সন্ততি লালন-পালনসহ পারিবারিক ও সামাজিক সকল ব্যয়ভার থেকে নারী সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এসব যাবতীয় দায়ভার স্বামী বা পিতার উপর আরোপিত হয়েছে। ইসলামে নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করা পিতা অথবা স্বামীর উপর আবশ্যক করেছে।

সংসারের যাবতীয় দায়ভার পুরুষের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার কারণ হ'ল শক্তি-ক্ষমতা, জ্ঞান-বুদ্ধি সহ কতিপয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দিয়ে পুরুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। নেতৃত্বের প্রধান উৎস-উপাদান হ'ল সেবাব্রত। সেবার যাবতীয় দায়িত্ব দিয়ে পুরুষকে নারীর অভিভাবক করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ، 'পুরুষেরা নারীদের অভিভাবক। এজন্য যে, আল্লাহ একের উপর অন্যকে প্রাধান্য দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য) তাদের মাল-সম্পদ হ'তে ব্যয় করে থাকে। অতএব সতী-সাধ্বী স্ত্রীরা হয় অনুগত এবং আল্লাহ যার হেফাযত করেছেন, আড়ালেও (সেই গুপ্তাঙ্গের) হেফাযত করে' *(নিসা ৪/৩৪)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا، 'আর জন্মদাতা পিতার দায়িত্ব হ'ল ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রসূতি মায়েদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। সাধ্যের অতিরিক্ত কাউকে বাধ্য করা যাবে না' *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হ'লে তিনি বলেন, أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، أَوِ اكْتَسَبْتَ، 'যখন তুমি আহার করবে তখন তাকেও (স্ত্রী) আহার করাবে, যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও বস্ত্র পরিধান করাবে'।[৩] অন্যত্র তিনি বলেন, وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِىْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ– 'আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা (যথাসম্ভব) তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহারের সুব্যবস্থা করবে'।[৪]

স্বামীর এ অভিভাবকত্ব অতিরিক্ত ক্ষমতা কিংবা দাপটের বিষয় নয়; বরং এটা তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে প্রিয় জীবনসঙ্গিনীকে আগলে রাখার নিখাদ প্রচেষ্টা। আর শীতল ছায়ায় থেকে ঘর গোছানো ও সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যত গড়ার তুলনামূলক সহজসাধ্য দায়িত্ব দেয়া হয়েছে নারীকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، 'নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল। সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[৫]

নারীর কর্মসংস্থান :

কর্মসংস্থান বলতে এমন কর্মব্যবস্থাপনা বুঝায় যাতে অংশ গ্রহণ করে একজন মানুষ তার আর্থিক প্রবৃদ্ধি ঘটাতে সক্ষম হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় খাতের ব্যয় নির্বাহ করার জন্যই মানুষ কর্মসংস্থানের মুখাপেক্ষী হয়। কিন্তু ইসলামী আইনে বিশেষ প্রয়োজন ব্যতিরেকে নারীর উপর ব্যয় নির্বাহের কোন দায় চাপিয়ে দেয়া হয়নি। নারীর যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করবে পুরুষ। সুতরাং নারীর কর্মসংস্থানের কোন প্রয়োজন নেই এবং থাকার কথাও নয়। স্বভাবজাত ও প্রাকৃতিকভাবেই নারীরা সংসারী। ঘরোয়া কাজের সাথে তাদের সংশ্লিষ্টতা ও আগ্রহবোধ একান্তই সৃষ্টিগত। সে হিসাবে তারা নিজ আগ্রহেই সংসার পরিচালনা করে থাকে। এক্ষেত্রে যদি তাদেরকে সাংসারিক এবং প্রাসঙ্গিক ব্যয় নির্বাহের উদ্দেশ্যে কর্মসংস্থানে যেতে বাধ্য করা হয় তবে এটা হবে তাদের উপর নিতান্তই বৈষম্যমূলক আচরণ। তাই শরী'আতে নারীদেরকে কর্মসংস্থানমুখী করতে বাধ্য করার কোন সুযোগ নেই।

---

১. *আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিয়্যাহ, ৭/৮২।*
২. *ইবনু আবীদ-দুনিয়া, আন-নাফাকাতু আলাল ইয়াল হা/৫২৮; মেদারাতুন নাস হা/১৭৩; আমালী ইবনু বুশরান হা/১১, সনদ হাসান, ড. নাজম আব্দুর রহমান খালফ।*
৩. *আবু দাঊদ হা/২১৪২-৪৩; মিশকাত হা/৩২৫৯; ছহীহাহ হা/৬৮৭।*
৪. *তিরমিযী হা/১১৬৩, ৩০৮৭; ইবনু মাজাহ হা/১৮৫১; ছহীহুল জামে' হা/৭৮৮০।*
৫. *বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৮২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।*

তবে নারী সমাজের কর্মতৎপরতা কেবলমাত্র বিদ্যা শিক্ষা, জ্ঞান অর্জন ও চিন্তা-গবেষণার ক্ষেত্র পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে ইসলাম এমন কথা বলেনি; বরং বাস্তব কাজে যথার্থ ভূমিকা পালনের জন্যে ইসলাম এক বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র তাদের জন্যে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভে অগ্রসর হ'তে পারে, তেমনি কৃষি ও ব্যবসায়ের কাজে পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

জীবিকার জন্যে বিভিন্ন কাজ কারবার, শিল্প-কারখানা স্থাপন, পরিচালনা বা তাতে কাজ করারও অধিকার রয়েছে নারীদের। সেই সঙ্গে সমাজ ও জাতির কল্যাণমূলক বহুবিধ সামষ্টিক কাজ আঞ্জাম দেয়াও তাদের জন্যে বৈধ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, নারীদের এসব কাজে নেমে যেতে হবে এবং এসব করা তাদের জন্য একান্ত যরূরী হয়ে পড়েছে। নারীরা এসব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ুক ইসলামে তা কাম্য নয়। তবে পরিবার বা সমাজে এমন কিছু পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যার কারণে নারীদেরও কর্মসংস্থানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন যথাসাধ্য শারঈ বিধান পালন সাপেক্ষে নারীদের জন্যও কর্মসংস্থানের অনুমতি ইসলাম দিয়েছে। তবে তাদের আলাদা কর্মক্ষেত্রের ব্যবস্থা করতে হবে। নারী-পুরুষের স্বাধীন ও অবাধ মেলামেশার ফলে সামাজিক জীবনে নৈতিক অধঃপতনের যে মারাত্মক ব্যধি দেখা দিয়েছে তা থেকে সমাজকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামে পর্দার বিধান আরোপ করা হয়েছে। আজকের নারীরা পর্দাকে অবরোধ ভাবছে। অথচ ইসলাম নারীকে শৃঙ্খলিত করেনি। পর্দার মাধ্যমে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। তাকে সংযত হ'তে এবং নিজেকে খোলা-খুলিভাবে প্রকাশ না করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে।

ইসলাম নারীদেরকে কর্মসংস্থান গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেনি। তার জন্য ক্রয়-বিক্রয় বা ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগসহ যাবতীয় লেনদেনে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে তাকে এ জাতীয় কারবারে অংশগ্রহণ করে শারঈ বিধান ও আচরণ বিধির ব্যাপারে যত্নবান হ'তে হবে।[6] নারীরা ৩টি শর্তে নিজ গৃহের বাইরে চাকুরি বা কাজ করতে যেতে পারবে, (١) ألا يكون العمل معصية (٢) ألا يكون عملها مما يكون فيه خلوة بأجنبي (٣) ألا تخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير الفتنة অর্থ : (১) কাজটি গোনাহের না হওয়া (২) নারীর কাজটি এমন না হওয়া যাতে পরপুরুষের সাথে নির্জনে কাজ করতে হয় (৩) কাজের জন্য এমন সাজসজ্জা সহকারে বেপর্দায় বের না হওয়া, যা ফিতনা-ফ্যাসাদের দিকে প্ররোচিত করে।[7]

নারীদের বাড়ীর বাইরের কাজ দু'ভাবে বিভক্ত। যথা-

১. এমন কাজ যেখানে নারীদের প্রয়োজন : ধাত্রী বা সন্তান জন্মদানে সহযোগিতা, মহিলাদের চিকিৎসা, বালিকা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের শিক্ষাদান প্রভৃতি ক্ষেত্রে কেবল মহিলাদের প্রয়োজন।

২. এমন কাজ যা পুরুষরা পালন করে, নারীদের যা করার প্রয়োজন হয় না : কৃষিকাজ, খামার পরিচালনা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প কারখানা পরিচালনা বা কারখানায় কাজ করা প্রভৃতি। কেবল বাধ্যগত প্রয়োজন ও সক্ষমতা থাকলে পূর্বোক্ত শর্তসাপেক্ষে মহিলাদের জন্য এসব কাজ করা জায়েয।

চাকুরী : বাড়ীতে অবস্থান করাই মহিলাদের কর্তব্য *(আহযাব ৩৩/৩৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, নারী হ'ল গোপন বস্তু। যখন সে বের হয়, শয়তান তার পিছু নেয়'।[8] তবে শর্তসাপেক্ষে স্ত্রীদেরকে চাকুরীর অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। যেমন (১) জীবিকার জন্য কাজ করতে বাধ্য হ'লে (২) কাজটি পুরুষদের সাথে মিলিতভাবে না হ'লে (৩) বাড়ির মধ্যেই করা যায় এরূপ কোন কাজ না পাওয়া গেলে (৪) সার্বক্ষণিক পর্দার মধ্যে থাকা সম্ভব হ'লে (৫) কাজটা ইসলাম বিরোধী না হ'লে (৬) কাজটি মহিলাদের কাজের উপযোগী হ'লে (৭) স্বামী, সন্তান এবং গৃহের ব্যাপারে অবহেলা সৃষ্টি না হলে (৮) কর্মক্ষেত্র যদি সফরের পর্যায়ে পড়ে, তাহ'লে মাহরাম সাথে থাকলে। উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ করা সাপেক্ষে মহিলাদেরকে চাকুরীর অনুমতি দেওয়া যাবে এবং প্রয়োজনে তার অর্জিত অর্থ গ্রহণ করা যাবে।[9]

পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে চাকুরী : এসব কর্মক্ষেত্র মহিলাদের জন্য উপযোগী নয়। বাধ্যগত অবস্থায় মহিলাদের চাকুরীর ক্ষেত্রে যেসব শর্ত প্রযোজ্য, দেশের নিরাপত্তা বাহিনীগুলিতে চাকুরীর ক্ষেত্রে তা পূরণ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। সেকারণ নারীদের জন্য এসব চাকুরী জায়েয নয়। আর অন্যায় কাজের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদও অবৈধ।[10]

গার্মেন্টসে চাকুরী : গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীগুলোতে নারী-পুরুষ একত্রে মিলে-মিশে কাজ করে থাকে। যা নিতান্তই গর্হিত কাজ। কারণ এতে পাপের দিকে ধাবিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়। অবাধ এই কর্মক্ষেত্র থেকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নারী ঘটিত বহু অপরাধের খবর মাঝে মধ্যেই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। নারী-পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা চোখের যেনা, হাত দিয়ে স্পর্শ করা হাতের যেনা, কথা শ্রবণ করা কানের যেনা এবং পা দিয়ে হেঁটে যাওয়া পায়ের যেনা বলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উল্লেখ করেছেন।[11] বর্তমানে অধিকাংশ গার্মেন্টসেই একই পরিবেশ বিরাজমান। অতএব মহিলাদের গার্মেন্টসে চাকুরী করা হ'তে বিরত থাকা আবশ্যক। উল্লেখ্য যে, নারীর দায়িত্ব সন্তান পালন ও পুরুষের দায়িত্ব পরিবারের ভরণ-

---

৬. *আল-মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ আল-কুয়াইতিয়্যাহ ৭/৮২।*
৭. *আল-মাউসূআতুল ফিক্বহিয়্যাহ আল-কুওয়াইতিয়্যাহ ৭/৮৩-৮৪।*
৮. *তিরমিযী হা/১১৭৩; মিশকাত হা/৩১০৯।*
৯. *ফাতাওয়াল মারআতিল মুসলিমাহ, ২/৯৮১; মাসিক আত-তাহরীক, আগস্ট'১১, প্রশ্ন ১১/৪১১, এপ্রিল'১৩ প্রশ্ন ৪/২৪৪।*
১০. *শারহুস সুন্নাহ, বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহুল জামে' হা/২০৮৫; মাসিক আত-তাহরীক, অক্টোবর'১৩, প্রশ্ন ৪/৪।*
১১. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৬ 'ঈমান' অধ্যায়।*

পোষণ। অথচ গার্মেন্টসে স্বল্প বেতনে নারীদের চাকুরী দিয়ে ও পুরুষদের বেকার রেখে প্রবল সামাজিক বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছে। সেই সাথে সন্তান ও পরিবার ধ্বংস হচ্ছে এবং শেষ হচ্ছে নারীদের ঈমান ও স্বাস্থ্য।[১২]

ব্যবসা : যেকোন হালাল ব্যবসা নারী ও পুরুষ সবার জন্য জায়েয। আল্লাহ বলেন, 'তিনি ব্যবসাকে হালাল করেছেন ও সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, কোন উপার্জন সবচেয়ে পবিত্র? তিনি বললেন, মানুষের নিজ হাতের উপার্জন এবং প্রত্যেক বৈধ ব্যবসা।[১৩] ইসলামের প্রথম যুগে মহিলাগণ ব্যবসা করতেন। কিন্তু পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার পর এবং পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা নিষিদ্ধ হওয়ার পর মহিলাদের জন্য ব্যবসা নিরুৎসাহিত করা হয়। কেননা এতে হালালের পথ ধরে হারামের অনুপ্রবেশ ঘটার আশংকা দেখা দেয়। বর্তমান যুগে যে ফিৎনা মহামারী আকার ধারণ করেছে। অতএব মুসলিম মহিলাদের অবশ্যই এ ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে।[১৪]

কৃষিকাজ : নিরুপায় অবস্থায় পর্দার মধ্যে থেকে পুরুষের সংস্পর্শ ছাড়াই যদি এরূপ কাজ করা সম্ভব হয়, তাহলে করতে বাধা নেই।[১৫] নিতান্ত বাধ্য হ'লে শারঈ পর্দা বজায় রেখে রাখাল-কিষাণের সহযোগিতা করা যাবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে বাড়ীতে থাকার জন্য আদেশ করেছেন *(আহযাব ৩৩/৩৩)* এবং বাড়ীর বাইরে পর্দা করে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন *(নূর ২৪/৩১)*।[১৬]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে জনৈকা নারী ছাহাবী তালাকপ্রাপ্তা হয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে নিজের বাগানের খেজুর সংগ্রহ করার অনুমতি চাইলে রাসূলে কারীম (ছাঃ) তাকে অনুমতি দেন। জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, طُلِّقَتْ خَالَتِي، فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا، فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا، 'আমার খালা তালাক প্রাপ্তা হ'লে নিজেদের খেজুর বাগানে গিয়ে খেজুর সংগ্রহ করার ইচ্ছা করেন। তখন এক ব্যক্তি তাকে বের হ'তে নিষেধ করে। ফলে তিনি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ তুমি তোমার খেজুর সংগ্রহ করতে পার। আশা করি তুমি ছাদাক্বাহ করবে অথবা সৎ কাজ করবে।[১৭]

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে, আবুবকর (রাঃ)-এর কন্যা আসমা (রাঃ) বলেন, যখন যুবায়ের (রাঃ) আমাকে বিবাহ করেন, তখন তার না ছিল সম্পত্তি, না ছিল চাকর-বাকর। একটা উট ও একটা ঘোড়াই ছিল তার সম্বল। ঘোড়াটাকে আমি ঘাস-পানি খাওয়াতাম। সাথে সেলাই ও গম ভাঙ্গার কাজও করতাম। আমি রুটি তৈরি করতে জানতাম না। আমার কয়েকজন ভাল আনছার মহিলা প্রতিবেশী আমাকে রুটি বানিয়ে দিতেন। কিছুদিন পরে রাসূল (ছাঃ) যুবায়ের (রাঃ)-কে একখণ্ড জমি দান করেন। সে জমি থেকে আমি শুকনো খেজুরের বীচি সংগ্রহ করে মাথায় বহন করে আনতাম'।[১৮]

মহিলাদের কর্মে নিযুক্তির ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন :

১. বৃদ্ধা, অক্ষম ও অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকাদের কর্মে নিযুক্ত না করা। কারণ তাদেরকে কাজে নিযুক্ত করা হ'লে তাদের সাধ্যের বাইরে কাজ চাপিয়ে দেওয়া হ'তে পারে। অনুরূপভাবে ছাত্রীদের কর্মে নিযুক্ত করে তাদের শিক্ষা গ্রহণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা।

২. মহিলারা সর্বদা সমান কাজ করতে পারে না। যেমন ঋতুবতী, গর্ভবতী অবস্থায়, প্রসবোত্তরকালে ও দুগ্ধদানকালে মহিলারা কাজ করতে গিয়ে নানা জটিলতা ও সমস্যায় পড়ে। তাই এসময় তাদের প্রতি সদয় হওয়া ও নম্র আচরণ করা কর্তব্য।

৩. মহিলাদের এমন কর্মে নিযুক্ত করা কিংবা তাদের কর্মঘণ্টা এমনভাবে বিন্যস্ত করা উচিত, যাতে তাদের পরিবারের দায়িত্ব পালনে ঘাটতি না হয়। যেমন তাদেরকে রাতে কোন ডিউটি না দেওয়া এবং সম্ভবপর তাদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে দেওয়া ইত্যাদি।

৪. মহিলাদের জন্য এমন স্থান নির্ধারণ করা ও এমন পরিবেশ করে দেওয়া যরূরী, যেখানে তারা স্বাচ্ছন্দ্যে কাজ করতে পারে। তাদের সার্বিক নিরাপত্তা, ইয্যত-আব্রু রক্ষা ও শারঈ পর্দা রক্ষা করার মত সুন্দর পরিবেশ করে দেওয়া কর্তব্য।

মহিলাদের কাজের জন্য যেসব ক্ষেত্র উত্তম :

মহিলাদের কাজ করার জন্য উত্তম ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. আল্লাহ্র দিকে দাওয়াত :

শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে থেকে মহিলারা নিজ এলাকায় মহিলাদের মধ্যে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে পারে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী, শিক্ষিকা ও মহিলা কর্মজীবিদের মাঝে দাওয়াতী কাজ অঞ্জাম দিতে পারে। এতে নিজে উপকৃত হবে এবং অন্যান্য মহিলারা আক্বীদা-আমল সংশোধন করে ইহকাল ও পরকালে উপকৃত হবে এবং সমাজ সংস্কার হবে।

২. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান :

বালিকা বিদ্যালয়, বালিকা মাদ্রাসা ও মহিলা কলেজ এবং মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের কাজ করতে পারে। এসব প্রতিষ্ঠানে তারা দ্বীনী ও আধুনিক শিক্ষায় মেয়েদের পারদর্শী ও যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারে,

---

১২. মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর'১৪, প্রশ্ন ৩১/৪৩১।
১৩. আহমাদ, মিশকাত হা/২৭৮৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬০৭।
১৪. মাসিক আত-তাহরীক, মার্চ'১১, প্রশ্ন ৩৭/২৩৭।
১৫. বুখারী হা/৫২২৪, মুসলিম হা/২১৮২।
১৬. মাসিক আত-তাহরীক, মে'১৩, প্রশ্ন ১৩/২৯৩।
১৭. মুসলিম হা/১৪৮৩।
১৮. বুখারী হা/৫২২৪।

যাতে তারা সংসার জীবনে দ্বীন মেনে চলতে পারে এবং ইবাদত-বন্দেগীও সাধ্যমত আদায় করতে পারে। আর তাদের উচ্চশিক্ষা কাজে লাগিয়ে সন্তানদের যুগোপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারে। রাসূল (ছাঃ) নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। হাদীছে এসেছে, আশ-শিফা বিনতু আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি হাফছাহ (রাঃ)-এর নিকটে ছিলাম, তখন নবী করীম (ছাঃ) আমার নিকটে এসে বললেন, أَلاَّ تُعَلِّمِينَ هَذِهِ رُقْيَةَ النَّمْلَةِ كَمَا عَلَّمْتِيهَا الْكِتَابَةَ 'তুমি ওকে (হাফছাহকে) যেভাবে লেখা শিখিয়েছ, সেভাবে ফুসকুড়ি বা ব্রণের ঝাড়ফুঁক শিক্ষা দাও না কেন'।[১৯]

৩. স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে :

মহিলাদের রোগ-ব্যাধির চিকিৎসায় যেমন মহিলা ডাক্তার প্রয়োজন, তেমনি মহিলা সেবিকা ও টেকনিশিয়ান প্রয়োজন। যারা মহিলাদের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাহায্য করতে পারে। অনুরূপভাবে সন্তান প্রসবকালে ধাত্রীর একান্ত প্রয়োজন হয়। এসব ক্ষেত্রে মহিলারা কর্মে নিযুক্ত হ'লে রোগীনীদের পর্দা রক্ষা করে যথাযথ সেবা দিতে পারে।

৪. গৃহের অভ্যন্তরের কাজ :

বাড়ীর অভ্যন্তরে থেকে নানা কাজ মহিলারা করতে পারে। যেমন মহিলাদের কাপড় সেলাই করা, দর্জির কাজ করা, বাড়ীতে নানা সুস্বাদু খাবার, মিষ্টি, কেক, পিঠা-পুলি, ফিরনী-পায়েশ ইত্যাদি তৈরী করে আশ-পাশে বিক্রি করা। মেয়েদেরকে রান্না, দর্জি ও সেলাই প্রশিক্ষণ দেওয়া ইত্যাদি কাজ নিজ বাড়ীতে বসে সম্পন্ন করা যায়।

৫. হস্ত ও কুটির শিল্প :

মহিলারা নিজ বাড়ীতে বসে সংসার পরিচালনার পাশাপাশি নানা হস্তশিল্প ও কুটির শিল্প নিজেরা তৈরী করতে পারে এবং এসব মেয়েদের শিক্ষা দিয়েও নিজেরা অর্থ উপার্জন করতে পারে। যেমন বাড়ীতে মোমবাতি, আগরবাতি, সাবান, টুপি সেলাই, নক্সীকাঁথা প্রভৃতি তৈরী করে বাজারজাত করা এবং এসব শিক্ষা দিয়ে অর্থ উপার্জন করতে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে মহিলারা এরূপ কাজ করতেন। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রী নিজে ঘরে বসে শিল্পকর্ম করতেন এবং তা বিক্রি করে ঘর-সংসারের খরচ চালাতেন। একদিন তিনি নবী কারীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি একজন কারিগর মহিলা। আমি হাতে তৈরি করা দ্রব্যাদি বিক্রি করি। এছাড়া আমার ও আমার স্বামীর এবং সন্তানদের জীবিকার অন্য কোন উপায় নেই। রাসূলে কারীম (ছাঃ) বললেন, এভাবে উপার্জন করে তুমি তোমার সংসারের প্রয়োজন পূরণ করছো। এতে তুমি বিরাট ছওয়াবের অধিকারী হবে।[২০]

মহিলারা কর্মে নিযুক্ত হ'লে যেসব ক্ষতি হয় :

মহিলারা পরিবার-পরিজনের সেবা, সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতি বাদ দিয়ে অর্থোপার্জনে নিযুক্ত হ'লে নানা সমস্যা তৈরী হয়। নিম্নে কতিপয় সমস্যা উল্লেখ করা হ'ল।-

১. পরিবারের দায়িত্ব পালনে ঘাটতি :

ইসলাম প্রত্যেক ব্যক্তির দায়িত্ব-কর্তব্য পৃথকভাবে নির্ধারণ করে দিয়েছে। এসব দায়িত্ব সম্পর্কে তাকে আল্লাহ্র কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং সে দায়িত্ব যথাযথ পালন করা কর্তব্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالإِمَامُ الَّذِى عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهْوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، 'তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল; আর তোমরা প্রত্যেকেই নিজ অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। অতএব ইমাম, যিনি জনগণের দায়িত্বশীল, তিনি তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ গৃহকর্তা তার পরিবারের দায়িত্বশীল; সে তার অধীনস্থদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। নারী তার স্বামীর পরিবার ও সন্তান-সন্ততির উপর দায়িত্বশীল, সে এদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[২১] সুতরাং তার দায়িত্ব স্বামীর বাড়ীর অভ্যন্তরের কাজ, সন্তান প্রতিপালন ও স্বামী সেবা করা। যখন সে বাড়ীর বাইরের কাজে লিপ্ত হবে তখন তার সন্তানদের ক্ষতি হবে, তাদের প্রতিপালনে ও স্বামীর সেবায় ঘাটতি হবে। যা এক সময় পরিবারে অশান্তি বয়ে আনবে।

শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, মহিলাদের কাজ পুরুষদের থেকে ভিন্ন। তারা বাড়ীর বাইরে কাজ করায় সন্তানদের ক্ষতি ও স্বামীর হক পূরণে ঘাটতি হয়। বিধায় তা নিষিদ্ধ। কেননা এর কারণে নারীদের স্বাভাবিক দায়িত্ব ব্যাহত হয় এবং তার উপরে ন্যাস্ত কর্তব্য শূণ্য হয়। যার ফলে মন্দ প্রজন্ম তৈরী হয় এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার ভিত্তির উপরে গড়ে ওঠা পারিবারিক বন্ধন ধ্বংস হয়।[২২]

২. শরী'আত বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়া :

মহিলারা বাড়ীর বাইরে কোন কাজে নিযুক্ত হ'লে শরী'আত বিরোধী নানা কর্মে জড়িয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। যেমন শারঈ পর্দার লংঘন, পরপুরুষের সাথে একত্রে কাজ করতে বাধ্য হওয়া, পরপুরুষের সাথে অপ্রয়োজনীয় আলাপচারিতায় লিপ্ত হওয়া, মাহরাম ব্যতীত দূরে সফর করতে বাধ্য হওয়া এবং কখনও পরপুরুষের সাথে নির্জনে একাকী হওয়া ইত্যাদি। এসব কাজ শরী'আত সম্মত নয়। অথচ মহিলারা চাকুরীতে নিযুক্ত হ'লে এসব কাজে অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে জড়িয়ে পড়তে হয়।

১৯. আহমাদ হা/২৭১৪০; আবু দাউদ হা/৩৮৮৭; ছহীহাহ হা/১৯৩১; ছহীহুল জামে' হা/২৬৫০।
২০. মুসনাদে আহমদ হা/১৬১৩০, ১৬০৮৬।
২১. বুখারী হা/৭১৩৮; মুসলিম হা/১৪২৯; মিশকাত হা/৩৬৮৫।
২২. শায়খ ইবনে বায, আত-তাবাররুজ ওয়া খুত্বূরাতুহু, পৃঃ ৩০-৩১।

৩. পুরুষের কাজের উপরে প্রভাব পড়া :

অনেক সময় মহিলারা পুরুষের তুলনায় একই কাজ অনেক নিম্ন বেতনে বা পারিশ্রমিকে গ্রহণ করে এবং পুরুষের সাথে একত্রে কাজ করে। এভাবে পুরুষের অধীনে কাজ করে তার মধ্যে সাহসিকতা বেড়ে যায়। যা পুরুষের জন্য অত্যধিক বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর হয়ে পড়ে। অথচ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ও ক্ষতিগ্রস্ত করা ইসলামে নিষিদ্ধ।[২৩] ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, এর অর্থ নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এবং একে অন্যের ক্ষতি করবে না।[২৪] আল-খুশানী বলেন, 'যারার' এমন কাজ যাতে তোমার নিজের উপকারিতা রয়েছে কিন্তু তোমার প্রতিবেশীর অনিষ্ট রয়েছে। আর 'যিরার' হচ্ছে যাতে তোমার নিজের কল্যাণ নেই এবং তাতে তোমার প্রতিবেশীর ক্ষতি রয়েছে।[২৫] সুতরাং কর্মক্ষেত্রে শরী'আতের নির্দেশনা মোতাবেক মহিলারা কাজ না করলে সে নিজে উপকৃত হ'লেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেখানকার কর্মরত পুরুষরা।

৪. নারীসুলভ কাজে ভাটা পড়া :

নারীর শরীর পুরুষদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন গঠনে আল্লাহ তৈরী করেছেন এবং তার দেহকে মাতৃত্বের দায়িত্ব পালনের উপযোগী করেছেন। শৈশব থেকেই তার স্বভাব-প্রকৃতি গৃহকর্ত্রী বা পরিবারের কর্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে প্রস্তুত হয়। কিন্তু যখন সে সংসার ও গৃহ ছেড়ে বাইরের কাজে বা চাকুরীতে নিযুক্ত হয়, তখন সবক্ষেত্রে নানা বিপদ-মুছীবত এসে পড়ে। প্রত্যেক শিশু অন্ততঃ তিন বছর মায়ের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিপালন ও সেবা-যত্নের মুখাপেক্ষী হয়। কিন্তু মায়ের চাকুরীর কারণে শিশু সেই সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। শিশুর শিক্ষা-দীক্ষা, নৈতিকতার বিকাশ ও চরিত্র গঠনে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। কর্মজীবি মায়ের পক্ষে শিশুর নিবিড় তত্ত্বাবধান সম্ভব নয়। ফলে মায়ের অনুপস্থিতিতে এসব শিশু নানা কুশিক্ষা লাভ করে, সমাজের নানা কু-প্রভাব তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়, অশ্লীল ভাষা ও অনৈতিক ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং নারীর যে মৌলিক কাজ সংসার শামলানো ও সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষা এবং স্বামীর সেবা- এসব পালন করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, মহিলাদের বাধ্যগত অবস্থা না হ'লে জীবিকার জন্য কর্মক্ষেত্রে যোগদান না করাই শ্রেয়। স্বামী-সংসার শামাল দিয়ে সন্তানদের শিক্ষা-দীক্ষায় ও চরিত্র মাধুর্যে যোগ্য করে গড়ে তুলতে পারলে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে। নারীজীবন সার্থক হবে এবং ইহকাল ও পরকালীন অশেষ কল্যাণ লাভ করবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ লাভে শরী'আতের নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করার তাওফীক দান করুন-আমীন!

২৩. আহমাদ হা/২৮৬৭; ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ইরওয়া হা/৮৯৬।
২৪. ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তামহীদ (মরক্কো : ওয়াযারাতুল আওক্বাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৪৮৭ হিঃ), ২০/১৫৮ পৃঃ।
২৫. ঐ, ২০/১৫৮ পৃঃ।

গাযার মৃত্যুপুরী থেকে

আমরা গত রাতে হঠাৎ বোমার শব্দে জেগে উঠি। দেখি, একটি তাঁবুতে বোমা হামলা হয়েছে। সেই তাঁবুতে কিছু ক্ষুধার্ত শিশু ঘুমিয়ে ছিল। এই হামলা তাদের ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুর কোলে নিয়ে গেল চিরতরে। তারা মারা গেল ক্ষুধার্ত অবস্থায়।

গাযার জনসংখ্যার প্রায় ৮০% এখন গাদাগাদি করে বস্তির তাঁবুতে বসবাস করছে খাবার ও পানীয় ছাড়া। অবরোধের কারণে তারা কিছুই খুঁজে পায় না খাওয়ার জন্য কিংবা পান করার মতো। তারা প্রতিনিয়ত ভীত অবস্থায় থাকে এই আশঙ্কায় যে, কখন যেন তারা আকাশ থেকে এলোমেলো গুলিবর্ষণের শিকার হয়! কারণ হেলিকপ্টার থেকে ভারী স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র দ্বারা গুলি ছোড়া হয়, যেগুলো দূরনিয়ন্ত্রিত।

অথবা তারা আতঙ্কে থাকে এফ-১৬ বা এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান থেকে বোমা পড়বে না তো? এসব বোমা নিমিষেই তাদের শরীরকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়। আর পুরো পরিবারসহ তাদের নাম স্থানান্তরিত হয়ে যায় নগরের রেজিস্ট্রার খাতা থেকে সোজা কবরবাসীর তালিকায়।

সংবাদমাধ্যমে বলা হচ্ছে, আজ নাকি কিছু খাদ্যসামগ্রী সীমান্ত দিয়ে ঢুকবে। অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইস্রাঈলীরা সেগুলো সীমান্তবর্তী এলাকায় রাখে, যেখানে ট্যাংকগুলো পাহারা দেয়। তারপর কেউ যদি ত্রাণের জন্য সেখানে যেতে চায়, তখনই তারা গুলি ছুঁড়ে দেয়। ফলে মানুষ নির্বিচারে নিহত কিংবা আহত হয়।

আর যদি কেউ ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য কিনতে চায়, তখন সেটা কিনতে হয় প্রকৃত মূল্যের ২০ গুণ দামে! যেমন- তিন কেজি ময়দার দাম ১০০ ডলার, যেখানে এর প্রকৃত মূল্য মাত্র ২ ডলার।

ইস্রাঈলীরা এখন পুরো উপত্যকার ৮০% অংশ দখল করে রেখেছে। অর্থাৎ গাযার সব মানুষ ঠাসাঠাসি করে বসবাস করছে মাত্র ২০% এলাকায়। এমনকি বসতবাড়িগুলোর অবস্থাও ভয়াবহ। প্রায় ৮০% ঘরবাড়ি ধ্বংস করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

গাযা সিটির খুবই সংকীর্ণ একটি এলাকায় জনগণকে থাকার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বাকি স্থানগুলোতে সাধারণ মানুষের যাওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সেখানে কেউ গেলে সরাসরি যুদ্ধবিমান এসে তাকে হত্যা করে।

এভাবেই কাটছে আমাদের কঠিন দুর্বিষহ জীবন। বিগত প্রায় দু'বছর যাবৎ। কেউ জানে না কোথায় গন্তব্য আমাদের... গাযার ২৩ লক্ষ মাযলূম জনগোষ্ঠীর। বিশ্ববাসীর নীরব দৃষ্টির সামনে মহা সাড়ম্বরে চলছে শতাব্দীর এক নৃশংসতম গণহত্যা...

-ড. হাসান নাছর বাযাযো
২৭.০৭.২০২৫
শিক্ষক ও ইমাম, খান ইউনুস, গাযা।

আরবী ভাষা চর্চা ও পাঠদান

*-সারওয়ার মিছবাহ**

আরবী কুরআন ও হাদীছের ভাষা। বলতে গেলে মাদ্রাসা শিক্ষার ভিত এই ভাষার ওপরে নির্মিত। তবে যখন আলোচনা হয় আরবী শিখা ও শিখানোর তখনই আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়। খুব অভিমান হয় বড়দের ওপর। মনে হয়, তারা যদি আমাদের প্রতি একটু যত্নবান হ'তেন! আমরা হয়ত ভাষাগত দিক থেকে আরেকটু সবল হ'তাম। আমাদের যখন মুখস্থের বয়স ছিল, যখন পড়াশোনার জোশ ছিল তখন আমাদেরকে পর্যাপ্ত আরবী শব্দ মুখস্থ করানো হয়নি। আমাদের কাছে মীযানুছ ছরফের ফার্সী ইবারত মুখস্থ শোনা হয়েছে। তাইসীরুল মুবতাদী আর মাছদারে ফুয়ূয এর ফার্সী মাছদার মুখস্থ করার জন্য চাপ দেয়া হয়েছে।

আমি ছাত্রজীবনে ফার্সী মীযানুছ ছরফ, নাহবেমীর, তাইসীরুল মুবতাদীর মাছদার, শেখ সাদীর পান্দনামাহ (কারীমা), গুলিস্তাঁ ইত্যাদি চার পাঁচটি ফার্সী কিতাব একাডেমিকভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুখস্থ করেছি। যখন মুখস্থ করতাম তখনই আমাদের মনে হ'ত, এগুলো তো বাংলাতে বুঝিই। তারপরও ফার্সী ইবারত মুখস্থের কোন দরকার আছে কি! আমাদেরকে তখন বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের মুখস্থ শক্তি যেন লোপ না পায় সেজন্য প্রতি বছর একটি করে কিতাব তোমাদেরকে মুখস্থ করানো হয়। তখন আমরা সেটাই যথাযথ মনে করেছি।

এখন মনে হয়, আমাদেরকে তিনশত ফার্সী মাছদার মুখস্থ না করিয়ে যদি তিনশত আরবী মাছদার মুখস্থ করানো হ'ত! আরবী কিতাব পড়ার যাত্রা যখন শুরু হয়েছে তখনই যদি আমরা ভাষাগত দিক থেকে সবল হ'তাম! তবে ইবারত পড়তে পেরেও অর্থ না বোঝার অভিশাপ হয়ত আমাদের দংশন করতে পারত না। সিলেবাস এবং পাঠদান পদ্ধতির করাল গ্রাসে আমরা পরিণত হয়েছি। আমরা চাই না, এই ধারা যুগ যুগান্ত র ধরে চলুক। আমরা আমাদের কষ্টের কথা বলেই যাব। এই সিস্টেম পরিবর্তন হোক বা না হোক। অন্তত বিবেকের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে যেন বলতে পারি, 'আমরা বলেছিলাম'!

আমাদের আরবী চর্চার চিত্র : আমাদের মাদ্রাসাগুলোতে আরবী চর্চার যতই বেহাল দশা হোক, লৌকিকতা রয়েছে শতভাগ। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে যখন কোন অনুষ্ঠান হয় তখন ছাত্রদেরকে আরবী রচনা মুখস্থ করিয়ে বক্তব্য দেয়ানো, বই থেকে আরবী মুকালামা মুখস্থ করিয়ে স্টেজে আরবী কথপোকথন করানো, মোটেও আরবী বোঝে না এমন ছাত্রদের কলম থেকে চমৎকার আরবী প্রবন্ধে দেয়ালিকা ছাপানো, এগুলোতে কেউ কারো থেকে কম নয়। কেউ কেউ তো আগ বাড়িয়ে এসব অনলাইনেও প্রচার করে। আর আমরা তাদের প্রচারে প্ররোচিত হয়ে ধোঁকা খাই।

প্রতিষ্ঠান বেড়াতে আমার ভাল লাগে। আমি একবার এক নামকরা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠানে বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার সাথে কয়েকজন ছাত্রও ছিল। সেখানে গিয়ে দেখলাম, একের পরে এক ছাত্র আরবীতে বক্তব্য দিচ্ছে। বিষয়ভিত্তিক সারগর্ভ আলোচনা করছে। তাদের বক্তব্যের ভাষাও উচ্চমানের। এটা দেখে ছাত্ররা আশ্চর্য হয়ে গেল। অনুষ্ঠান শেষে যখন মাদ্রাসার ভেতরে ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম তখন অনেকগুলো আরবী দেয়ালিকাও দেখলাম। যেখানে মাধ্যমিকের ছাত্রদের লেখা অত্যন্ত ফছীহ আরবীতে প্রবন্ধ-নিবন্ধ দেখার সৌভাগ্য হ'ল। ছাত্ররা বিস্ময় ধরে রাখতে না পেরে বলল, এত নিচের ক্লাসে এগুলো কিভাবে সম্ভব!

আমি বললাম, দেখো! যে ছেলেগুলো আরবীতে স্টেজ গরম করা বক্তব্য দিল তাদের যদি একই বিষয়ে বাংলাতে বক্তব্য দিতে বলা হয়, তবে কি তারা এভাবে বক্তব্য দিতে পারবে? ছাত্ররা চুপ। আমি বললাম, পারবে না। যদি পারত তবে আমরা এতদিন অনেক নামযশা বক্তা পেতাম। কারণ, এই প্রতিষ্ঠান ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে এভাবে বক্তা প্রদর্শন করে আসছে। যারা আজ থেকে ১০ বছর আগে স্টেজ গরম করেছে সেসব বক্তারা কোথায়! আর তোমরা যে আরবী লেখাগুলো দেখে মুগ্ধ হচ্ছো তারাও এত সুন্দর বাংলা লিখে না। তারা যদি এই মানের বাংলা লিখতে পারত তবে তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় এই শ খানেক লেখকের লেখা পেতে। তাহ'লে এই চোখ ধাঁধানো প্রদর্শনীর দু'টি ভেদ হ'তে পারে। প্রথমত, এই ছেলেগুলো বাংলার চেয়ে আরবী ভাল বোঝে। এটা তো সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত এরা রচনা মুখস্থ করে বক্তব্য দিচ্ছে আর বিভিন্ন সোর্স থেকে কপি করে প্রবন্ধ লিখছে।

আজ আমাদের আরবী চর্চার উদ্দেশ্য, মানুষ বলবে, 'অমুক প্রতিষ্ঠানে খুব আরবী চর্চা হয়'। সুতরাং আমরা প্রচারমুখী চর্চা করি। ফলাফলে লোকমুখে প্রসিদ্ধি ছাড়া আমাদের আর কোনই অর্জন নেই। আমাদের ছাত্ররা বলে, ওমুক প্রতিষ্ঠানে মাধ্যমিকের ওপরের ছাত্ররা নাকি বাংলা বলতে পারে না। বাধ্যতামূলক সবাইকে সবসময় আরবী বলতে হয়। তারা না বুঝুক, আমরা তো বুঝি যে, এগুলো প্রতিষ্ঠান নিয়ম তৈরি করে ষোল আনা প্রচার করার জন্য। তবে বাস্তবায়নে চার আনাও পাওয়া যায় না। আমরা শুধু এতটুকু বলি যে, 'দশ বার বছর আরবীতে কথা বলার পরে এই ছেলেগুলো সব কোথায় যায়'!

ভেবে দেখুন! টানা পাঁচ বছর যদি কেউ আরবীতে কথা বলে তবে তো তার আরবী বাংলা সমান হয়ে যাওয়ার কথা। এই আদীবগুলো লেখাপড়া শেষে কোথায় হারিয়ে যায়? তারা নিজেদেরকে আদীবরূপে প্রকাশ করছে না কেন! বালুতে মুখ গুঁজে সাইমুমকে অস্বীকার করা যায় না। বছর বছর ধরে নিজেদের আরবী চর্চার ঢাক পিটিয়ে বেড়ানো এই প্রতিষ্ঠানগুলো কেন আজও কোন যোগ্য ব্যক্তি জাতির সামনে উপস্থাপন করতে পারছে না! এর কোন জবাব কি তাদের ঝুলিতে আছে! দেখুন! আরবী চর্চা কোন প্রচারের বিষয় নয়। এর নিজস্ব সুঘ্রাণ রয়েছে। যা আপনাতেই ছড়িয়ে পড়ে।

** শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।*

সুতরাং লৌকিকতা ছাড়ুন। আরবী শাস্ত্রের রিজাল তৈরিতে মনোনিবেশ করুন। আলোচ্য প্রবন্ধের ধাপে ধাপে আমরা কিছু প্রস্তাবনা রাখব, যা আরবী পাঠদান পদ্ধতিকে আরো সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে আরবী শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ তৈরিতে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ।

আরবীর প্রকারভেদ : শুরুতেই আমরা আরবীকে দুই ভাগে ভাগ করব। ক্বাদীম এবং জাদীদ এই দুই ধারার আরবী আমাদের সকলের কাছেই পরিচিত। তবে আমি এই প্রকারভেদ নিয়ে কথা বলব না। আমি বলব ভিন্ন দুইটি প্রকার নিয়ে। এক প্রকারের আরবী আছে যা পাঠের মাধ্যমে আরবী শেখা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের আরবী পাঠের মাধ্যমে আরবী শেখা যায় না, বরং আরবী জানা থাকলে সেটা পাঠ করা যায়। দুইটি বিষয় কাছাকাছি। তবে একটি অপরটির চেয়ে আলাদা। এই সূক্ষ্ম পার্থক্যটি আমাদের পুস্তক প্রণেতাগণ বোঝার চেষ্টা করেন না। আমি বিষয়টি আরেকটু সহজ করে বলার চেষ্টা করছি।

কিছু আরবী আছে যা মানের বিচারে শতভাগ উত্তীর্ণ। তবে সেই আরবী থেকে আরবী শেখা যায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যপুস্তকগুলো। এই সকল পাঠ্যপুস্তক থেকে পূর্ণাঙ্গ আরবী শিখেছেন এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া গেলে যেতেও পারে। তবে তা খুবই কম। কারণ, এই আরবীগুলো বন্ধ্যা। তারা সন্তান প্রসব করে না। একটি বাক্য পড়ার পরে সেই ধরণের আরেকটি বাক্য গঠনের যোগ্যতা পাঠকের হয় না। তবে দুঃখের বিষয় হ'ল, সিলেবাসে আমরা এই ধরণের আরবী সংবলিত বই-ই রাখার চেষ্টা করি। কারণ, এই আরবী বইগুলো সাহিত্যের মানে শতভাগ উত্তীর্ণ। তবুও এই বইগুলো থেকে আমাদের ছাত্রদের আরবী শেখা আর হয়ে ওঠে না।

আরেক ধরণের আরবী আছে যা মানের বিচারে শতভাগ উত্তীর্ণ নয়। যারা সাহিত্যের মান বোঝেন তাদের কাছে এই ধরণের আরবী তেমন একটা পসন্দ নয়। কারণ, সেখানে একই শব্দ ও বাক্য বার বার আসে। তুলনামূলক সহজ শব্দ ব্যবহার করা হয়। বাক্যের গঠন সংক্ষিপ্ত ও সাবলীল হয়। এই ধরণের আরবী সংবলিত বইগুলো আধুনিক সিলেবাসে অবহেলিত হয়। কারণ, সেগুলো সাহিত্যের মানে উত্তীর্ণ নয়। তবে এই বইগুলো থেকে আরবী শেখা যায়। আমরা চাই, আরবী শেখানোর জন্য ঐ বইগুলো সিলেবাসভূক্ত করা হোক যে বইগুলো পড়ে আরবী শেখা যাবে।

এসো আরবী শিখি পাঠদান পদ্ধতি ও আমাদের অঙ্গনে তার উপযুক্ততা : সত্যি বলতে আমরা সিলেবাসকে শুধু সমৃদ্ধরূপে প্রদর্শনই করতে চাই। বাস্তবে তা কতটুকু কার্যকর হ'ল তা ভেবে দেখি না। মানুষ যেন সিলেবাস দেখে বলে, 'মাশাআল্লাহ! কত সমৃদ্ধ সিলেবাস! মাদ্রাসা বোর্ডের বইগুলোও আছে, কওমীধারার বইগুলোও আছে, আবার মাদানী নেসাবের বইগুলোও দেখছি পড়ানো হয়'! তবে এত বই পড়ার ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়, এটা আসলে সমৃদ্ধি নয়, এটা জগাখিঁচুড়ি। বিষয়টি একটু বুঝিয়ে বলি।

আমরা বরাবরই বলে এসেছি, এসো আরবী শিখি যদি পড়াতে হয় তবে তার নিজস্ব নিয়মেই পড়াতে হবে। ঘন্টার পরে ঘন্টা শিক্ষক উপস্থিত থেকে তামরীন করিয়েই পড়াতে হবে। কিন্তু আমাদের তো সিলেবাস সমৃদ্ধ করার ওপরেই মনোযোগ বেশি। এত নামকরা একটি কিতাব তো আর সিলেবাসের বাইরে রাখা যায় না। আমরা সপ্তাহে দুইদিন বিশ মিনিট করে তরজমা পড়িয়ে বই শেষ করব। ফলাফলে তিন খণ্ড শেষ করার পরেও একজন শিক্ষার্থী 'মসজিদের নতুন দরজা' এর আরবী বলতে পারে না।

দেখুন! এই বইটি আলিয়া মাদ্রাসাগুলোর জন্য নয়। কারণ, আলিয়া মাদ্রাসার ঘণ্টাগুলো ছোট ছোট। সাবজেক্ট অনেক বেশি। এই বই থেকে উপকৃত হওয়ার জন্য সময় বরাদ্দের প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে উপযুক্ত পরিবেশ ও মাদানী নেসাব পড়ুয়া শিক্ষকের। আমাদের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেই যা সম্ভব নয়। তাই আমাদের প্রয়োজন নিজেদের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত কিতাব ও পাঠদান পদ্ধতি। অনেক পরে হ'লেও সে কিতাবগুলো এখন সংকলিত হচ্ছে। অনেকেই এর পেছনে নিজেদের শ্রম ব্যয় করছেন। আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদান দিন - আমীন! আমরা এখন আলিয়া শিক্ষাব্যবস্থায় কার্যকরী আরবী পাঠদান পদ্ধতি প্রস্তাব করব। প্রথমে আমরা মৌলিক বিষয়গুলোর প্রয়োজনীয় পরিমাণ জানব যে, কোন বিষয়টি আমাদের কতটুকু দরকার। এরপরে আমরা পাঠদান পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করব।

আরবী শিখতে ব্যাকরণ কতটুকু দরকার : আমাদের ছাত্ররা এসে বলে, 'আমরা আরবী শিখতে চাই। তাহ'লে কি আগে মীযান পড়ব, নাকি নাহু পড়ব'! আমরা তাদেরকে বলি, মীযান বা নাহুতে তো আরবী শেখানো হয় না। আরবী ব্যাকরণ শেখানো হয়। আর ব্যাকরণ ভাষা শুদ্ধ করার জন্য শেখা হয়। সুতরাং আগে ভাষা শিখো। তারপর না হয় ভাষা শুদ্ধ করা যাবে। ধান কাটার পূর্বেই যেমন তা মাড়াই করা হয় না, তেমনই ভাষা শেখার পূর্বেই তা শুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। তবে আমরা মুখে যাই বলি, ছাত্ররা জানে যে, আরবী শেখার প্রথম বই হ'ল মীযানুছ ছরফ। সিলেবাস তাদেরকে এটা শিখিয়েছে। তাই তারা সবকিছু শুনে বুঝেও মীযানুছ ছরফ দিয়েই আরবী শেখা শুরু করে।

আমরা মনে করি, ছরফে ছহীহ এর ব্যবহার জানার জন্য মীযানুছ ছরফ এবং গায়রে ছহীহ এর ব্যবহার জানার জন্য পাঞ্জেগাঞ্জ লেভেলের কোন একটি বই পড়া থাকলেই যথেষ্ট। এর অতিরিক্ত যে ছরফ জানা হবে তা খুব একটা কাজে আসবে না। যবরের পরে ওয়াও বা ইয়া হারাকাতযুক্ত হ'লে তা আলিফ দ্বারা পরিবর্তিত হয়। এটা পাঞ্জেগাঞ্জেই জানা যায়। ইলমুছ ছীগাহ তে এই মূলনীতির ১৪টি শর্ত শেখানো হয়। যা খুব একটা যরূরী নয়।

ইজতেমায়ে সাকিনাইনের কারণে 'মাকূলুন' শব্দের ভেতর থেকে দুইটি ওয়াও এর একটি পড়ে গেছে। এটা

পাঞ্জেগাঞ্জেই জানা গেছে। এখন কোন ওয়াওটি পড়েছে এই নিয়ে তিন পৃষ্ঠা যাবৎ যুদ্ধ পরিচালনা করার পরে লেখক কারণ দর্শালেন যে, কেউ যদি বলে, আমি আজ সারাদিনে যদি অতিরিক্ত ওয়াও যুক্ত কোন শব্দ বলি তবে আমার বিবি তালাক হয়ে যাবে। তারপরও সে 'মাকূলুন' শব্দটি বলল। এখন তার বিবি তালাক হয়েছে নাকি হয়নি এটা নির্ণয় করার জন্যই এই আলোচনা। এবার আপনিই বলুন, এই কারণ জানার পরে একজন শিক্ষার্থীর কেমন লাগবে! এই ধরণের খেজুরি আলাপও 'ইলমুছ ছীগাহ'-তে রয়েছে।

চলার মত নাহুর জ্ঞান নাহবেমীরেই হয়ে যায়। তারপরও অতিরিক্ত ইলমের জন্য হিদায়াতুন্নাহু পড়া যেতে পারে। তবে হিদায়াতুন্নাহুর পরে আরো নাহুর কিতাব পড়াটা একটু বেশিই ঢং হয়ে যায়। আমি তো বলি, হিদায়াতুন্নাহুরও অনেক আলোচনা অতিরিক্ত। যেমন তানাযু এর আলোচনা। যা কোনদিন কোন কাজে আসবে না। সুতরাং যারা সিলেবাস সমৃদ্ধ করার জন্য কাফিয়া, শরহে জামী, আন-নাহু আল-ওয়াযেহ ইত্যাদি বই রেখেছেন তারা সিলেবাস সমৃদ্ধ করতে গিয়ে নিজেদের অপারগতা প্রকাশ করে ফেলছেন। অপারগতা এই যে, হয়ত আপনি জানেনই না যে, আরবী শিখতে কতটুকু নাহু জানা প্রয়োজন। নয়ত আপনারা ছাত্রদের স্তরভেদে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারছেন না। দেখুন! কিতাবের আধিক্য মুখ্য নয়, শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল সেটাই মুখ্য হওয়া উচিৎ।

ভাষা শিক্ষায় শব্দের ভূমিকা : আমরা সর্বদাই শিক্ষার্থীদের বলি, ভাষা শিক্ষায় শব্দ বা মুফরাদাত হ'ল ইটের মত। আর ব্যাকরণ সিমেন্ট ও বালুর মত। যা ইটের গাঁথুনিকে মযবূত করে। এবার তোমরা বল দেখি, শুধুমাত্র বালু বা সিমেন্ট দিয়ে কখনো দেয়াল হয়? তারা বলে, না। আমরা বলি, তবে শুধু ইটের ওপরে ইট সাজিয়ে দেয়াল হয়। ধাক্কা দিলে পড়ে যাবে সেটা পরের আলাপন। মনে করো, আমার খুব পিপাসা পেয়েছে। এক গ্লাস পানি প্রয়োজন। এদিকে আমি নাহু-ছরফের ইমাম পর্যায়ের একজন ব্যক্তি। তবে গ্লাস, পানি বা প্রয়োজন কোনটিরও আরবী আমার জানা নেই। এখন আমার পূর্ণ বৈয়াকরণিক শক্তি দিয়ে কি একজন আরবকে আমার পানির প্রয়োজন বুঝাতে পারবো? কখনোই না।

তবে আমার যদি শব্দগুলো জানা থাকতো এবং আমি সেগুলো কোন কায়েদা-কানুন ছাড়াই ধারাবাহিক মুখ থেকে বের করতাম, তবে একজন আরব বুঝতে পারত যে, আমার এক গ্লাস পানির দরকার। যদিও আমার বাক্য গঠন ভুল হ'ত। এটাই ভাষা। মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা। আগে মনের ভাব প্রকাশ করার সক্ষমতা অর্জন, এরপরে ভাষা শুদ্ধিকরণ। এদিকে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করতে শিখার আগেই ভাষা শুদ্ধ করার মিশনে নামি। পরিশেষে আমাদের ঝুলিতে শুধু শুদ্ধতাই থাকে, ভাষা থাকে না। এই পরিশুদ্ধ ঝুলি নিয়েই আমরা ভবিষ্যতের হাল ধরি।

শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার মাধ্যম : আরবী শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ করার অনেক মাধ্যমই রয়েছে। একেকজনের কাছে একেকটি কার্যকরী মনে হ'তে পারে। তবে আমি এখানে সেগুলোই উল্লেখ করবো যেগুলোর মাধ্যমে আমি নিজে ফলাফল পেয়েছি। আমরা অনেক আরবী শব্দ জানি। শব্দগুলো মাঝে মাঝে বলিও। যদি আমরা সেই সকল শব্দগুলোর অর্থ এবং ব্যবহার শিখে যাই তবে এখানেই আমাদের অনেক আরবী শব্দ জানা হয়ে যাবে। উদাহরণ স্বরূপ দৈনন্দিন মাসনূন দো'আসমূহ। এখানে কত সুন্দর সুন্দর ইসম ও ফে'ল ব্যবহৃত হয়েছে তা একটু খেয়াল করলেই আশ্চর্য হই। এত সুন্দর ও উচ্চমানের বাক্যগঠন পদ্ধতি বড় বড় তা'বীরের কিতাবেও অনুপস্থিত।

একদিন একটি আরবী লেখা তৈরি করতে গিয়ে আমার শিশির শব্দের আরবী প্রয়োজন হ'ল। তবে শিশিরের আরবী আমার জানা ছিল না। অভিধান খুঁজতে গিয়ে দেখলাম 'বার্‌দ' অর্থ শিশির। অথচ আমি জানতাম, বার্‌দ অর্থ ঠাণ্ডা। এই শব্দটিই যে শিশির অর্থে ব্যবহৃত হয় সেটা আমি নতুন জানলাম। তখনই মনে হ'ল, আমি তো প্রত্যেক ছালাতেই ছানার মাঝে এই শব্দের ব্যবহার পড়ি। কিন্তু কখনো খেয়াল করা হয়নি। তারপর থেকে আমি মুখস্থ দো'আ, হাদীছ ও কুরআন থেকে শব্দ শেখা শুরু করলাম। এই পদ্ধতি আমার কাছে যেমন সহজ তেমনই ফলদায়ক ছিল।

কুরআন থেকে শব্দ শেখার জন্য আমি 'শব্দে শব্দে আল-কুরআন' সংগ্রহ করলাম। প্রতিদিন দুয়েক রুকু পড়তাম। কয়েকবার পড়তাম। শব্দগুলোর অর্থ, রূপ, মাদ্দাহ, জিনস ভেবে ভেবে পড়তাম। খুব অল্পদিনেই আমি এখান থেকে ফলাফল পেয়েছি। এভাবে আরবী পড়ার পাশাপাশি প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ মিনিট আরবী শুনতাম। ছাহাবায়ে কেরাম ও বিভিন্ন ইমামগণের প্রসিদ্ধ ঘটনাগুলো এ্যনিমিশন আকারে ইউটিউবে পাওয়া যায়। যার ভাষা খুব সুন্দর। উচ্চারণগুলো একদম নিখুঁত। ৬/৭ মিনিটের একটি কন্টেন্ট দুই তিনবার দেখতাম। সেখানে ব্যবহৃত অনেক সুন্দর সুন্দর বাক্য এমনিতেই মনে থাকত। এগুলো মুখস্থের প্রয়োজন হ'ত না।

এই পদ্ধতিতে পড়া ও শোনা আমার আরবীর শব্দভাণ্ডার অনেকটাই সমৃদ্ধ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ। কোনরকম আনুষ্ঠানিকভাবে শব্দ মুখস্থ করা ছাড়াই আমি অনেক প্রয়োজনীয় শব্দ ও বাক্যগঠন পদ্ধতি শিখতে পেরেছি। আমি প্রতিনিয়তই শিখছি। হয়ত ভবিষ্যতে আরো কার্যকরী পদ্ধতি শিখব। তখন সেগুলোও লিখব ইনশাআল্লাহ। তবে এখন শব্দভাণ্ডার মযবূত করার জন্য এর চেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি আমার জানা নেই।

আরবী পাঠদানের আদর্শ রূপরেখা : প্রথমেই বলব, সিলেবাসে আরবী ব্যাকরণ ততটুকুই রাখুন যতটুকু না হ'লেই নয়। শিক্ষার্থীদের সরাসরি ভাষার সাথে পরিচিত হ'তে দিন। প্রাথমিকে পাঠদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিন শব্দ মুখস্থ করার ওপরে। প্রাথমিক হ'ল মুখস্থের সময়। এই সময়ে যদি শব্দভাণ্ডার বাড়িয়ে নেয়া না যায় তবে পরবর্তীতে তা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। প্রাথমিকে ঐ

বইগুলো সিলেবাসভুক্ত করুন যেখানে অনেক বেশি শব্দার্থ আছে। শব্দভাণ্ডার বাড়ানোর জন্য বইয়ের পাশাপাশি মুখস্থ দো'আ, হাদীছ ও বিভিন্ন সূরা থেকে শব্দ শেখান। শব্দ শেখানোর পদ্ধতি হ'ল, এখানে ব্যবহৃত ইসমগুলোর একবচন, বহুবচন ও মাদ্দাহ আয়ত্ব করিয়ে দেওয়া। ফে'লগুলো দিয়ে তাছরীফ করিয়ে দেওয়া। তাহ'লে এই ইসম ও ফে'লগুলো সে আর ভুলবে না।

আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই অনাবাসিক। তারা বাড়ি থেকে লেখাপড়া করে। আপনি যতই নছীহত করুন না কেন, তারা মোবাইলের সংস্পর্শে যাবেই। সুতরাং অভিভাবকদের বলুন, তারা যেন বাচ্চাদের আরবী কন্টেন্ট দেখান। কারণ, ভাষা শেখার সবচেয়ে শক্তিশালি মাধ্যম হ'ল শুনে শেখা। যখন কিছুই জানতাম না তখন আমরা শোনার মাধ্যমে বাংলা শিখেছি। তাহ'লে বড় হওয়ার পরে কেন আমরা শুনে ভাষা শিখতে পারব না! আমি তো এমন বাচ্চাও দেখেছি, যে দশের অধিক ভাষা বলতে পারে শুধুমাত্র কন্টেন্ট দেখে। সুতরাং কন্টেন্টকে অবহেলা করবেন না।

আবাসিক শিক্ষার্থীদেরকে আরবী কন্টেন্টের সাথে পরিচিত করতে ব্যক্তিগত ল্যাপটপ বা ট্যাবের সাথে ছোট বক্স যুক্ত করে মাঝে মাঝে ক্লাসেই ছাত্রদেরকে কন্টেন্ট দেখান। যে কন্টেন্ট দেখাবেন তা চালু করার আগেই তাদেরকে কন্টেন্টের ঘটনা এবং কথপোকথনগুলো বাংলায় বলে দিন। এতে তারা সহজেই ভাষাগুলো বুঝতে পারবে। ছুটিতে বাড়িতে গিয়ে যেন তারাও এই মাধ্যম থেকে উপকৃত হয়। দেখুন! শিক্ষক মানেই দারোগা নয়। ছাত্রদের কাছাকাছি হোন। তাদেরকে কন্টেন্ট নির্বাচনে, চ্যানেল খুঁজে পেতে ও ইত্যাদি কাজে সাহায্য করুন। এটা তাদের ওপরে আপনার বাড়তি ইহসান।

মাধ্যমিকে আরবী ইবারত পড়ার ওপরে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিন। মাধ্যমিকে ঐ সকল বই সিলেবাসে রাখুন যেখানে অনেক বেশি আরবী ইবারত আছে। যেখানে ইবারতগুলো সাবলীল ও সহজ। সেই বইগুলো থেকে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি ইবারত পড়ান। একই ইবারত ক্লাসের সকল শিক্ষার্থীকে পড়ান। মাধ্যমিকে এটাই মূল বিষয়। আমাদের পাঠ্যসূচী অনেক ভারি। সুতরাং আমাদের একটু ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে হবে। একদিনেই সব হয়ে যাবে না। আমাদের ছাত্ররা মাধ্যমিকেই আরবী লিখতে পারবে না। আরবী লেখা ও বলার অনুশীলন শুরু হবে উচ্চ-মাধ্যমিক থেকে। এবার আসুন, আমরা উচ্চ-মাধ্যমিকের আরবী নিয়ে আলোচনা করি।

উচ্চ-মাধ্যমিকে ইনশা : উচ্চ-মাধ্যমিকের আরবী বলতেই ইনশা সবার অগ্রে থাকে। এখানে আমাদের একটি সরকারী পাঠদান পদ্ধতি আছে। শিক্ষক একলাইন আরবী পড়ে তার অনুবাদ করেন। এরপর ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেন, বোঝা গেল? তারা সমস্বরে বলে জ্বি। শিক্ষক তখন পরের লাইন পড়ে তার অনুবাদ করেন। আবার একই প্রশ, একই উত্তর। শিক্ষক তৃতীয় লাইনে যান। এইভাবে পাতার পরে পাতা উল্টে একসময় বইও শেষ হয়। শিক্ষকও খুশি, শিক্ষার্থীও খুশি। এই পদ্ধতিতে নাহু, ছরফ, বালাগাত, সাহিত্য, হাদীছ, তাফসীর সব পড়ানো যায়। তবে আজব বিষয় হ'ল এই সরকারী পদ্ধতিতে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকগণ ইনশাও পড়ান!

একবার চিন্তা করুন, ইনশার কিতাবে একজন শিক্ষক লাইনের পরে লাইন পড়ছেন এবং অনুবাদ করছেন! আরবী সাহিত্য পরীক্ষায় যেমন বই থেকে একটি অংশ তুলে দিয়ে অনুবাদ করতে বলা হচ্ছে তেমনই ইনশা পরীক্ষাতেও ইনশা বই থেকে ইবারত তুলে দিয়ে অনুবাদ করতে বলা হচ্ছে! তাহক্বীক্ব ও তারকীব করতে বলা হচ্ছে। আমাদের মনে হয়, এভাবে ইনশা পড়ানোর চেয়ে না পড়ানো অনেক শ্রেয়। অন্তত ছাত্রদের জানা থাকবে যে, তারা ইনশা পড়েনি। এই বিষয়ে জাহালাতে মুরাক্কাবাহ থেকে বেঁচে যাবে!

ইনশা পাঠদানের পূর্বে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, যাদেরকে ইনশা পড়ানো হচ্ছে তারা প্রাথমিক স্তরের আরবী সাবলীলভাবে পড়তে পারে এবং বুঝতে পারে। এতটুকু যোগ্যতা যদি শিক্ষার্থীদের না থাকে তবে তাদের জন্য ইনশা নয়। ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্রই যদি এই মানে উত্তীর্ণ না হয় তবে তাদের ইনশা না পড়িয়ে সে স্থানে ভিন্ন কোন আরবী শেখার বই পড়ানো যেতে পারে। এই বর্ষেও তারা আরবীই শিখুক। ইনশা পড়ার জন্য জীবন পড়ে আছে। তবে আরবী না বুঝেই যদি একবার ইনশা পড়ে ফেলে তবে তাদের জীবনে এই ঘা কাটিয়ে ওঠা বেশ মুশকিল।

প্রশ্নপত্র ও পাঠদান পদ্ধতি : শিক্ষককে প্রথমেই মনে রাখতে হবে, ইনশা পাঠদানে ছাত্ররা আরবী বলতে শিখবে না। ইনশা পাঠদান হবে সৃজনশীল লেখার ওপর ভিত্তি করে। একটি বাক্যের আলোকে শিক্ষার্থীরা কয়েকটি বাক্য লিখবে। একটি অনুচ্ছেদ বা ছোট রচনাকে সামনে রেখে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে ছোট বড় রচনা লিখবে। এই যোগ্যতা যতটুকু অর্জিত হবে ততটুকুই ইনশা। তারকীব তাহক্বীক্ব তো নাহুর বিষয়। একটি ইনশার প্রশ্নপত্রে যদি শুধু অনুবাদ, তাশকীল, তাহক্বীক্ব ও তারকীব থাকে তবে সেই পরীক্ষায় শতভাগ নম্বর পাওয়ার জন্য ইনশা পড়ার কোন প্রয়োজন আছে কী! আরেকটু আগ বেড়ে বললে ইনশা ক্লাসে একদিনও উপস্থিত থাকার প্রয়োজন আছে কী! সুতরাং পাঠদান পদ্ধতি এবং প্রশ্নপত্রের ধরন পরিবর্তন করা যরূরী।

আমাদের পাঠদান পদ্ধতি ইবারত ও অনুবাদে সীমাবদ্ধ হওয়ার কারণে আমাদের প্রশ্নপত্রগুলোও গদবাধা ধারায় চলে এসেছে। মনে করুন, আমার হাতে একটি প্রশ্নপত্র আছে। এখানে ছয়টি প্রশ্ন আছে। প্রতিটি প্রশ্নের মাঝে আলিফ, বা, জিম মিলিয়ে তিনটি ছোট প্রশ্ন আছে। প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে ইবারত রয়েছে। আলিফে তাশকীল ও তরজমা করতে বলা হয়েছে। বা-তে কয়েকটি নির্দিষ্ট শব্দের তাহক্বীক্ব করতে বলা হয়েছে। জিমে একটি বাক্যের তারকীব করতে বলা হয়েছে। এবার আপনি বলুন তো এটা কোন বিষয়ের প্রশ্নপত্র! আপনি বলতে পারবেন না। কারণ, এটা স্বাভাবিকভাবে সাহিত্য, হাদীছ, তাফসীর যেকোন বিষয়ের হ'তে পারে। এজন্যই

নাহু-ছরফে যারা ভাল, তারা সব বিষয়েই ভাল। সব বিষয়েই তারা তাহক্বীক্ব ও তারকীব করেই নম্বর পায়।

পাঠদান পদ্ধতির সমস্যা আজ ভাইরাসের মত পুস্তক, প্রশ্নপত্র, নম্বর, যোগ্যতা সবই খেয়ে ফেলেছে। মুহাদ্দিছ ছাহেব ক্লাসে যা পড়ান, মুফাসসির ছাহেবও তাই পড়ান। অর্থাৎ সরকারী পাঠদান পদ্ধতি। আমরা চাই, এই পদ্ধতি বিলুপ্ত হোক। ছরফের ক্লাসে শুধু ছরফই পড়ানো হোক। নাহুর ক্লাসে নাহু। আরবীর সবগুলো বিষয়েই যদি শিক্ষার্থীর নাহু-ছরফ যাচাই করা হয় তবে ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবে এটাকেই ইলম মনে করবে। মৌলিক ইলম রেখে নাহু-ছরফকেই জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বানাবে। মাদ্রাসা পড়ুয়াদের বড় একটা অংশ এমন হয়েও গেছে।

আমরা জানি, আলোচ্য প্রবন্ধে আরবী পাঠদানের সব বিষয় আলোচিত হয়নি। যতটুকু হয়েছে তাও সম্পূর্ণ নয়। হয়ত অনেক কথাই অতিরঞ্জিত মনে হয়েছে। তবে আমরা যা বলেছি, নিরেট বাস্তবতা থেকেই বলেছি। লেখক হিসাবে বলিনি, আরবী ভাষার ভালোবাসা থেকে বলেছি। আরবীর প্রতি ভালোবাসা নিয়ে একবার তার পাঠদান পদ্ধতির দিকে তাকান। আপনারও অন্তর কাঁদবে। মনে হবে, 'এটা ঠিক হচ্ছে না'। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা যতটুকু বলেছি, এতটুকু পরিবর্তনও যদি সম্ভব হয় তবে আমরা হয়ত অনেক এগিয়ে যাব। আমরা হয়ত কিছু যোগ্য মানুষ পাব। যাদের মাধ্যমে এই অনারব ভূখণ্ডে কুরআন ও হাদীছের খিদমাহ হবে। ছাদাক্বায়ে জারিয়ায় সুশোভিত সেই দিনকে সামনে রেখে আমরা স্বপ্ন বুনি। রাত জাগি। পদচিহ্ন রেখে যাই। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন এবং সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

দৃষ্টি আকর্ষণ

আত-তাহরীক-এ প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের দায়ভার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞাপন দাতার। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোন দায়বদ্ধতা নেই। *-সম্পাদক*।

ডিলারশীপ ও পাইকারী ক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

খুচরা মূল্য :

- কালোজিরা ফুলের মৌসুমের মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- বরই ফুলের প্রাকৃতিক মধু-৫০০ গ্রাম ৫৯০/-
- প্রাকৃতিক বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৫৫০/-
- বিভিন্ন ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ৩৪০/-
- সরিষা ও লিচু ফুলের মিক্স মধু-৫০০ গ্রাম ২৯৫/-
- শক্তি প্লাস আরোগ্য কালোজিরা তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-
- শক্তি প্লাস শান্তির দূত জয়তুন তেল ৭৫ মিলি. ১৭০/-

যোগাযোগ : প্রত্যাশা এন্টারপ্রাইজ, প্রসাদপুর বাজার, মান্দা, নওগাঁ। মোবাইল : ০১৭৮২-৪৬৪০৯৮

ATAB MEMBER
Biman BANGLADESH AIRLINES

ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস

ট্রাভেল এজেন্সী নিবন্ধন সনদ নং ০০১৩৫৯৬, ATAB রেজিঃ নং ১৭১৪২

আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহ

সম্মানিত হজ্জ ও ওমরাহ গমনেচ্ছু ভাই ও বোনেরা! ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস (সাবেক **ক্বাযী হজ্জ কাফেলা**) বিগত কয়েক বছর যাবৎ রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো পদ্ধতি মোতাবেক পবিত্র হজ্জ ও ওমরাহ পালনকারীদের খিদমত করে আসছে। আগামী বছরগুলিতেও এ ট্রাভেলস আপনাদের খিদমতে নিয়োজিত থাকবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সকলকে বিশুদ্ধ নিয়তে ও সুন্নাতসম্মত পদ্ধতিতে হজ্জব্রত পালনের তাওফীক দান করুন-আমীন!

আমাদের বৈশিষ্ট্য সমূহ :

- পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মোতাবেক হজ্জ ও ওমরাহ্র সকল কার্যাবলী সম্পন্ন করার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।
- একাধিক প্যাকেজ মোতাবেক উভয় হারামের সম্ভবপর নিকটবর্তী স্থানে আবাসনের ব্যবস্থা।
- দেশী বাবুর্চী দ্বারা রান্না করা খাবারের ব্যবস্থা।
- ঢাকা বিমানবন্দর হ'তে শুরু করে ফেরত আসা পর্যন্ত সার্বক্ষণিক গাইডের ব্যবস্থা।
- হজ্জ ও ওমরাহ্র যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধা করার জন্য নিয়মিত তা'লীমের ব্যবস্থা।

বিঃ দ্রঃ

- **সব সময় হজ্জের প্রাক-নিবন্ধন চালু আছে।**
- **প্রতিমাসে ওমরাহ্র প্যাকেজ চালু থাকবে (যাত্রী হওয়া সাপেক্ষে)। সেক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই) মাস আগে যোগাযোগ করতে হবে।**

ঢাকা অফিস : ক্বাযী হারূণ ট্রাভেলস, আল-আমীন কমপ্লেক্স, ২৬২, ফকিরের পুল (৪র্থ তলা, স্যুট নং ৪০৩), মতিঝিল, ঢাকা- ১০০০। মোবাইল নং ০১৭১১-৭৮৮২৩৫, ০১৭১৩-৩৮০২৩৩। ই-মেইল : quaziharuntravels1967@gmail.com

রাজশাহী অফিস : ক্বাযী হারূণুর রশীদ, ইসলামিক কমপ্লেক্স মার্কেট, নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৭১১-৭৮৮২৩৫।

পুত্র সন্তানদের উপদেশ ও শাসনের সঠিক কৌশল : এক মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

*জাহিদ হাসান**

পুত্র সন্তানদের আচরণ সংশোধনে অনেক সময় পিতা-মাতা বা অভিভাবক যেভাবে উপদেশ দেন বা শাসন করেন, তা ফলপ্রসূ না হয়ে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। বিশেষ করে, বকা-ঝকা বা মারধর যদি প্রকাশ্যে হয় বা ঘন ঘন হয়, তাহ'লে সন্তান আরও যেদী, নির্লিপ্ত বা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা পুত্র সন্তানদের মানসিক গঠনের ওপর আলোকপাত করব। বোঝানোর চেষ্টা করব, কিভাবে ছেলে সন্তানদের উপদেশ দেয়া ও সংশোধন করা উচিত।

পুত্র সন্তানের মনস্তত্ত্ব : ছেলে সন্তানরা তুলনামূলকভাবে বেশী আত্মসম্মানবোধ (ego/self-respect) ধারণ করে। সাধারণত তারা সরাসরি এবং স্পষ্ট যোগাযোগ পসন্দ করে। তারা দীর্ঘ বক্তৃতা বা পুনরাবৃত্তিমূলক উপদেশ শুনতে অস্বস্তি বোধ করে। প্রকাশ্যে অপমানিত বা দোষারোপ হ'লে অধিক প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। আবেগ প্রকাশে সংকোচবোধ করে বা অন্তর্মুখী হয়ে থাকে। নির্দেশ বা বকার চেয়ে তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা অধিক পসন্দ করে। আসুন! আমরা পুত্র সন্তানকে গঠনমূলক ভাবে উপদেশ দেওয়ার উপায় সম্পর্কে জানার চেষ্টা করি।

প্রথমত - স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিন যে, কোন আচরণটি আপনি পসন্দ করেন না। কারণ পুত্র সন্তানরা সরাসরি কথা বুঝতে পসন্দ করে। তাই তাদেরকে বকাঝকা না করে পরিষ্কারভাবে বলুন, কোন আচরণটি আপনার অপসন্দনীয় এবং কেন এটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এভাবে বলবেন না যে, 'তুই কোনদিন মানুষ হবি না!' বরং এভাবে বলুন, 'তুমি আজকে যেভাবে ছোট ভাইকে ধমক দিয়েছ, সেটা আমাদের পরিবারে গ্রহণযোগ্য না। আমরা সবার সাথে সবসময় সম্মান দিয়ে কথা বলি।' আপনি যদি এভাবে অপরাধ বা ভুল আচরণটি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেন, তাহ'লে শিশুটি বুঝতে পারবে, কি নিয়ে অভিযোগ করা হচ্ছে। এতে সে সংশোধনের সুযোগ পাবে।

দ্বিতীয়ত - ব্যাখ্যা দিন, কেন এই আচরণটি খারাপ। শুধু 'এটা করো না' বললে শিশু বুঝতে পারবে না যে, কেন এটি করা উচিত নয়। বরং তাকে যুক্তি দিয়ে বোঝান যে, এই আচরণের ফলে তার নিজেরই ক্ষতি হচ্ছে। এভাবে বলবেন না যে, 'তুই একটা বেয়াদব ছেলে। বড়দের সাথে কেউ এভাবে কথা বলে?' বরং এভাবে বলুন, 'যদি তুমি বড়দের সাথে অভদ্রভাবে কথা বল, তাহ'লে ভবিষ্যতে সবাই তোমাকে এড়িয়ে চলবে। তুমি কখনো শ্রদ্ধা পাবে না।' এভাবে যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা দিলে সন্তান নিজেই উপলব্ধি করতে পারবে যে, এই আচরণের ফলাফল কি হ'তে পারে। এতে আচরণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা অনেক বেশী।

তৃতীয়ত - কখনোই জনসম্মুখে উপদেশ বা অপমান নয়। পুত্র সন্তানরা তাদের সম্মান নিয়ে খুব সচেতন। তাই তাদের ভুলগুলো শুধরে দিতে হ'লে একান্তে ডেকে নিয়ে শান্তভাবে বলুন। প্রকাশ্যে বকা দিলে তারা লজ্জা পাবে এবং যেদী হয়ে উঠতে পারে। ভাই-বোন, আত্মীয় বা বন্ধুদের সামনে এভাবে বলবেন না যে, 'তুই তো সবসময় বাড়াবাড়ি করিস!' বরং এভাবে বলুন, 'তোমার সাথে আমি একটু একা কথা বলতে চাই'। তাকে আলাদাভাবে নিয়ে শান্তভাবে বোঝান। জনসম্মুখে বলা হ'লে শিশুর আত্মসম্মান আহত হয়। সে অপমানবোধ করে ও প্রতিরোধমূলক আচরণ করতে পারে।

চতুর্থ বিষয়, ছেলেরা অনেক সময় অভিমানী হয়। তাই তার ইগো ও আত্মমর্যাদার প্রতি সম্মান দেখান। ছেলে শিশুরা তাদের স্বাধীনতা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা নিয়ে গর্ববোধ করে। তাই তাদের সাথে এমনভাবে কথা বলুন যেন তারা বুঝতে পারে যে আপনি তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছেন। এভাবে বলবেন না যে, 'তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না, তুমি সবসময় অলসতা কর।' বরং এভাবে বলুন, 'আমি জানি তুমি পারো, শুধু একটু মনোযোগ দিতে হবে। তুমি যদি চেষ্টা করো, অবশ্যই ভালো ফলাফল করতে পারবে।' কারণ ইতিবাচক মনোভাব শিশুকে উৎসাহিত করে। তাই তাদেরকে অপমান বা হুমকি নয়।

পঞ্চম বিষয় হ'ল, তাদেরকে শেখানোর মনোভাব রাখতে হবে। শিশুকে শুধু বকা না দিয়ে বরং তার মতামত জানতে চান এবং তার সমস্যা বুঝতে চেষ্টা করুন। এতে সে আপনার সাথে খোলামেলা আলোচনা করতে পারবে। তাদেরকে এভাবে বলবেন না যে, 'তুমি কেন সব সময় বন্ধুদের সাথে বাইরে ঘুরে বেড়াও?' বরং এভাবে বলুন, 'তোমার বন্ধুদের সাথে সময় কাটাতে ভালো লাগে, তাই না? কিন্তু আমাদের বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক থাকতে হবে। সব বন্ধু ভালো হয় না। এছাড়াও বন্ধুদের সাথে যদি অধিক সময় কাটাও তবে পড়াশোনার ক্ষতি হ'তে পারে। তাই আমি চাই, তুমি বাড়ির কাজ ও পড়াশোনার দিকেও সময় দিবে।'

ষষ্ঠ বিষয়, ইতিবাচক সমর্থন দিন। যখন সন্তান ভালো কাজ করে, দায়িত্বশীল হয়, তখন তাকে উৎসাহিত করুন। এতে সে বুঝবে যে, সে নিজের ভালো আচরণের জন্য প্রশংসা পাচ্ছে। তাকে এভাবে উৎসাহ দিতে পারেন যে, 'তুমি যে পিতার সাথে কুরবানির গোশত কাটার কাজে সাহায্য করেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি! এভাবে সব সময় পিতাকে সাহায্য করে যাও।'

যেহেতু উপদেশ বা শাসনও এক ধরনের যোগাযোগ, তাই তা হ'তে হবে রুচিশীল, সম্মানজনক। মনে রাখবেন, ভালো উপদেশ মানে শুধুই ভুল ধরিয়ে দেওয়া নয়; বরং এমনভাবে বলা, যেন সেই উপদেশটি শ্রোতার হৃদয়ে গেঁথে যায় এবং নিজের ভুলটা সে নিজেই বুঝে নেয়। সবশেষে বলব, পুত্র সন্তানদের সাথে যোগাযোগ একটি শিল্প। যা চর্চার মাধ্যমে নিখুঁত হয়। তাদের মানসিকতা বুঝে, সম্মান দিয়ে এবং যুক্তি সহকারে কথা বললে তারা আরো সহযোগিতাপূর্ণ হয়ে ওঠে। মনে রাখতে হবে, আমাদের লক্ষ্য শুধু আজ্ঞাবহ সন্তান গড়া নয়। একজন দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী এবং সুখী মানুষ হিসাবে তাদের গড়ে তোলা।

সুতরাং, পুত্র সন্তানদের উপদেশ দিতে গিয়ে বকা-ঝকা, অপমান বা তুলনা নয়, প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের মন বুঝে সম্মানের সাথে সঠিকভাবে বোঝানো উচিত। তবেই শিশুর মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে এবং সে একদিন গঠনমূলক, আত্মবিশ্বাসী ও দায়িত্বশীল একজন মানুষ হয়ে উঠবে। আপনিও হবেন এক অনন্য শিল্পী, যিনি কথার মাধ্যমে (সন্তানদের) এক সুন্দর চরিত্র গড়ে তুলছেন।

** সহকারী শিক্ষক, শান্তি নিকেতন ইন্সটিটিউট, ফেনী।*

নীল জুতার দো‘আ

-আব্দুল্লাহ আল-মা‘রূফ

জুম‘আর ছালাত শেষে আমরা সবাই মিলে ঠিক করলাম, আজ একটু সৎ ও ভালো মানুষের সঙ্গে সময় কাটাব। তাদের গল্প শুনব, উপদেশ নেব, যেন মনটা শান্ত হয়। তাই সবাই মিলে চললাম আলী চাচার বাড়িতে।

আলী চাচা আমাদের এলাকার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম। আমরা তার ঘরে ঢুকলাম। একদম সাদামাটা ঘর। তিনি আমাদের দেখে হাসলেন। তার মুখের মিষ্টি হাসি দেখলে কখনোই মনে হয় না তিনি বিরক্ত। তার সাদা দাড়ি যেন মুক্তার মত ঝিলমিল করছে। তার গায়ে সাদা জুব্বা ও টুপি যেন সেখান থেকে ফুলের ঘ্রাণ ছড়াচ্ছে। পোশাক পুরনো হ’লেও একেবারে পরিষ্কার, যেমন তার মনটা; সেখানে একটুও হিংসা নেই। তাকে দেখলে সালাফদের কথা মনে হয়। তার কাছে বসে থাকলে বা তার উপদেশ শুনলে ঈমান বেড়ে যায়, হৃদয়জুড়ে এক ইলাহী প্রশান্তির পরশ ছুঁয়ে যায়।

কুশলাদি বিনিময়ের পর তিনি আমাদেরকে বসতে বললেন এবং নরম মাটির ওপর পুরনো একটা মাদুর বিছিয়ে দিলেন। তারপর খেজুর এনে আমাদের সামনে রাখলেন। বললেন, ‘খাও বেটারা’।

আমরা খেতে শুরু করলাম। খাওয়া শেষে কিছু খেজুর বাকী রয়ে গেল। তখন আলী চাচা তার ছোট ছেলেকে ডাকলেন। ছেলের নাম ছিল আস‘আদ। আলী চাচা এই নাম রেখেছেন ছাহাবী আস‘আদ ইবনে যুরারা (রাঃ)-এর নামে।

আস‘আদ এসে বাকী খেজুর তুলে নিল। যাওয়ার সময় সে পিতাকে বলল, ‘আব্বা! আগামীকাল মাদ্রাসা খুলবে। আমার জুতাটা পুরনো হয়ে গেছে। নতুন জুতা প্রয়োজন।

আমরা ভাবলাম, আলী চাচা নিশ্চয়ই টাকা বের করে দিবেন। কিন্তু তিনি তো অন্যরকম! তিনি ছেলেকে কাছে ডেকে আদর করে বললেন, ‘বাবা! আল্লাহ্‌র কাছে জুতা চাও। তোমার আব্বার কাছে তো টাকা নেই’।

ছোট্ট আস‘আদ তখন কী করল জানেন? সে দৌড়ে গিয়ে ওযূ করল, তারপর মুছাল্লা বিছিয়ে দু’রাক‘আত ছালাত আদায় করল। এরপর সে কচি হাত দু’টো আকাশের দিকে তুলে দো‘আ করল। তার দো‘আর ভাষাগুলো শুনে আমাদের চোখে পানি চলে এল। সে বলল, ‘হে আল্লাহ! আগামীকাল মাদ্রাসা খুলবে। আমার জুতা পুরনো হয়ে গেছে। আমি আব্বাকে বলেছি, কিন্তু আব্বা বলেছেন তার কাছে টাকা নেই। তাই আমি তোমার কাছেই চাই। আমাকে একটা নতুন জুতা দাও। তবে নীল রঙের জুতা চাই। আমার বন্ধু ওমর যেমন জুতা পরে, ঠিক তেমন নীল জুতা দিও। কালকের মধ্যেই দিও আল্লাহ। কাল তো মাদ্রাসা খুলবে!’

আমরা অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম, এই ছেলের যদি জুতা না আসে, তাহ’লে তার বিশ্বাস ভেঙে যাবে। মনটা খারাপ হবে। হয়তো আর কখনো আল্লাহকে ডাকবে না! কিন্তু আল্লাহ্‌র কাছে যদি কেউ খাঁটি মনে চায়, আল্লাহ তো তাকে ফেরান না। মহান আল্লাহ সালাফদের মতো এই ছেলেটার বিশ্বাসের মর্যাদা রাখলেন।

কিছুক্ষণ পর দরজায় টোকা পড়ল।

-কে?

-আমি, আব্দুল্লাহ্‌র আম্মু।

আস‘আদ দৌড়ে গিয়ে বলল, ‘জুতা এসেছে! ধন্যবাদ হে আল্লাহ!’

আমরা ভাবলাম, হয়তো না-ও হ’তে পারে। যদি সত্যিই জুতা না আসে, তাহ’লে ছেলেটার কী হবে! কিন্তু আল্লাহ আমাদের ধারণা ভুল প্রমাণ করলেন।

আস‘আদ ফিরে এলো। হাতে উজ্জ্বল লাল-নীল রঙের ফুল আঁকা একটা সুন্দর বাক্স।

আস‘আদ বলল, ‘আব্বা, এই যে জুতা!’

আলী চাচা হেসে বললেন, ‘কিভাবে এলো বাবা?’

আস‘আদ বলল, ‘আমাদের প্রতিবেশী আব্দুল্লাহ্‌র আম্মু এসেছিলেন। বললেন, তার ছেলে আব্দুল্লাহ্‌র জন্য এই জুতা কিনেছিলেন। কিন্তু জুতাটা তার পায়ে ছোট হয়। তাই আমাকে দিয়ে গেলেন।

আলী চাচা বললেন, ‘বাহ! আল্লাহ তো তোমার দো‘আ কবুল করেছেন’। আস‘আদ খুশি হয়ে বলল, ‘হ্যাঁ আব্বা! এটা নীল রঙের জুতা। ঠিক ওমরের জুতার মতো’।

আলী চাচা বললেন, দেখলে বাবা! যে আল্লাহ্‌র দরজায় গিয়ে সত্যি মনে কিছু চায়, আল্লাহ তাকে কখনো খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না’।

পিতা-মাতার জন্য শিক্ষা :

(১) সন্তানদের আল্লাহ্‌র উপর সম্পূর্ণ ভরসার শিক্ষা দিন। তাদেরকে শুধু জাগতিক উপায় শেখাবেন না। শেখান– প্রথমে আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে হয়। কারণ তিনিই মূল দাতা। আল্লাহ্‌র কাছে দো‘আ করা যেন তাদের স্বাভাবিক অভ্যাসে পরিণত হয়।

(২) প্রয়োজনে দুনিয়ার কাছে হাত না পেতে আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে উৎসাহিত করুন। সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে চাওয়ার মাধ্যমে সন্তানের ঈমান বৃদ্ধি পায়। এতে আত্মমর্যাদা রক্ষা হয় ও পরনির্ভরতা কমে।

(৩) ঘরে দ্বীনী পরিবেশ সৃষ্টি করুন। আলী চাচার মতো ঘরকে ছোট্ট এক মাদ্রাসায় পরিণত করুন। নবী-রাসূল, ছাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে ছালেহীনের জীবন নিয়ে সন্তানদের সাথে গল্প করুন।

(৪) সন্তানদের চাওয়াকে অবহেলা না করে সঠিক দিকনির্দেশনা দিন।

(৫) সন্তানদের সামান্য ইবাদতেও উৎসাহ দিন। ছালাত আদায় করা, দো‘আ করা, সিজদায় গিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে বলার অভ্যাস তৈরী করুন।

সোনামণিদের জন্য শিক্ষা :

(১) আল্লাহ্‌র কাছে চাইতে কখনো লজ্জা পাবে না। যে ছোট্ট ছেলেটা নতুন জুতা চেয়েছিল, সে সরাসরি আল্লাহ্‌র কাছে বলেছিল। তাই তুমিও আল্লাহ্‌র কাছে নিজের প্রয়োজন খুলে বলবে।

(২) বিশ্বাস করো, আল্লাহ সবসময় তোমার কথা শুনছেন। চাওয়ার পর যদি সময় লাগে, তবুও হতাশ হবে না। কারণ আল্লাহ কখনোই খালি হাতে ফেরান না।

(৩) ছোট-ছোট প্রয়োজনেও আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে। যেমন খেলনা, বই, জামা, জুতা সবই আল্লাহ্‌র কাছেই চাইবে। এতে তোমার দো‘আর শক্তি বাড়বে।

(৪) বন্ধুরা যা পায়, তুমিও চাইতে পারো। তবে অন্যের হিংসা করবে না; বরং আল্লাহ্‌র কাছে চাইবে। তিনি চাইলে তোমাকেও দিবেন।

(৫) সাহস ও ধৈর্য রাখবে। যদি দো‘আ কবুল হ’তে একটু দেরী হয়, তবুও অপেক্ষা করবে। কারণ আল্লাহ যখন দেন, সুন্দর করেই দেন।

হেপাটাইটিস থেকে বাঁচার উপায়

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, বিশ্বজুড়ে বর্তমানে ৩০ কোটি ৪০ লাখ মানুষ হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি'-তে আক্রান্ত। ২০২২ সালে হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি'-এর সংক্রমণে বিশ্বব্যাপী ১৩ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। উন্নত বিশ্বের তুলনায় বাংলাদেশে এই রোগের হার বেশী।

হেপাটাইটিস কী : হেপাটাইটিস হচ্ছে যকৃতের প্রদাহ। নানা ভাইরাসের সংক্রমণে যকৃতে প্রদাহ হয়ে থাকে। এর কিছুতে স্বল্পমেয়াদী প্রদাহ হয়, যেমন হেপাটাইটিস 'এ' ও 'ই'। আবার কোন কোন ভাইরাসে দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ হয়, যার থেকে সিরোসিস, এমনকি লিভার ক্যানসার পর্যন্ত হ'তে পারে। হেপাটাইটিস গোত্রের ভাইরাস ছাড়াও কিছু জীবাণু লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

স্বল্পমেয়াদী বা একিউট হেপাটাইটিস : জন্ডিসের অন্যতম কারণ হেপাটাইটিস 'এ' ও 'ই' ভাইরাস। এই দু'টিই দূষিত খাবার ও পানির মাধ্যমে ছড়ায়। এরা স্বল্পমেয়াদী সংক্রমণ করে থাকে। জন্ডিসের উপসর্গ, যেমন অরুচি, বমিভাব, বমি, প্রস্রাবের রং হলদে হওয়া, চোখ ও হাতের তালু হলুদ হওয়া। সাধারণত সঠিক পরিচর্যা ও বিশ্রামে এক-দুই মাসে এই সংক্রমণ সেরে যায়। তবে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের হেপাটাইটিস 'ই' সংক্রমণ থেকে গুরুতর হ'তে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী বা ক্রনিক হেপাটাইটিস : হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ সৃষ্টি করে। এটি সাধারণত রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। অনিরাপদ রক্তসঞ্চালন, শিরায় মাদক গ্রহণ, দূষিত অনিরাপদ ইনজেকশন, সিরিঞ্জ বা ধারালো বস্তুর ব্যবহার এবং অনিরাপদ যৌনসংসর্গের মাধ্যমে এটা সংক্রমিত হয়। দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ থেকে লিভার সিরোসিস, এমনকি লিভার ক্যানসার হ'তে পারে। অনেকে নীরব বাহক হিসাবে থাকেন, অনেক সময় অন্য কোন পরীক্ষা করতে গিয়ে শনাক্ত হয়।

বর্তমানে দীর্ঘমেয়াদী হেপাটাইটিসের সুচিকিৎসা দেশে আছে। কুসংস্কারে বিশ্বাস না করে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা নিতে হবে।

হেপাটাইটিস প্রতিরোধের উপায় : পানিবাহিত হেপাটাইটিস রোধ করতে বিশুদ্ধ পানি পান করতে হবে। বাইরের খোলা খাবার ও পানি, শরবত, জুস থেকে দূরে থাকুন।

রান্না, পরিবেশন ও ধোঁয়ার কাজে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। টয়লেট ব্যবহারের পর, খাবার আগে, খাবার প্রস্তুত করার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। রক্তসঞ্চালনে সতর্ক থাকতে হবে। অনিরাপদ রক্ত কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়। কেবল পরীক্ষিত রক্তদাতার রক্ত গ্রহণ করা যাবে।

হেপাটাইটিস 'এ' ও 'বি'-এর কার্যকর টিকা আছে। টিকাগুলো নিতে হবে। শিশুদের হেপাটাইটিস 'বি' টিকা বর্তমানে জাতীয় টিকা প্রকল্পেও দেওয়া হচ্ছে।

ডায়াবেটিস রোগীর জন্য নিরাপদ ফলমূল

পাকা আম থেকে মিষ্টি ছফেদা দেখে জিভে পানি এসে গেলে খেতে পারেন না ডায়াবেটিস রোগীরা। এ ফলগুলো যে একেবারে খাওয়া যায় না, তা নয়। কিন্তু খেতে গেলে ক্যালরির হিসাব কষা দরকার। কারণ সাধারণত ডায়াবেটিস রোগীকে এমন খাবার খেতে বলা হয়, যেসবে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম থাকে। অর্থাৎ যে খাবার খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায় না। কিন্তু আম থেকে আঙুর, আনারসের মতো ফলের পুষ্টিগুণ থাকলেও সেগুলোতে শর্করার মাত্রাও যথেষ্ট থাকে। গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও নেহাত কম নয়। এসব ফল নিয়মিত খাওয়া ঠিক নয়, বিশেষত ভরপেট খাওয়ার পর।

যেকোন রসালো ফল ডায়াবেটিস রোগীরা খেলেও তা খেতে হবে মেপে। সাধারণত ভাত-রুটি খাওয়ার পরেই রসালো ফল খেতে বারণ করা হয়। এতে ক্যালোরির মাত্রা বেড়ে যায়। তবে পুষ্টিবিদদের মতে দু'টি খাবার খাওয়ার মাঝের সময়টিতে তা খাওয়া যেতে পারে। কারণ ক্যালরির হিসাব এ ক্ষেত্রে যরূরী এবং খেতেও হয় পরিমিত।

রসালো ফলের বদলে ডায়াবেটিস রোগীরা যে ফল খাবেন।-

আমের বদলে বেরি : ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর আমে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ রয়েছে, যা আসলে শর্করা। একটি মাঝারি আকারের আমে ৪০-৫০ গ্রাম শর্করা মেলে। আমের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৫১-৬০ অর্থাৎ মধ্যম থেকে উচ্চমাত্রার। ফাইবার থাকলেও গোটা বড় আম ডায়াবেটিস রোগীরা খেয়ে ফেললে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে। কয়েক টুকরো খাওয়ায় আপত্তি নেই। একটি মাঝারি আম খেলে অন্য খাবার খাওয়া কমাতে হবে। এর বদলে যে কোন বেরি জাতীয় ফল নির্দ্বিধায় খাওয়া যায়। স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, আমলকী জাতীয় ফল খেতে পারেন ডায়াবেটিস রোগীরা। এই ফলগুলোর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম অথচ পুষ্টিগুণ যথেষ্ট।

পাকা কলার বদলে পেয়ারা : পাকা কলাতেও ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু নিয়ম জেনে পরিমিত পরিমাণে খাওয়া যায়। তবে কলার বদলে পেয়ারা ডায়াবেটিস রোগীর জন্য ভালো। ফাইবার সম্পন্ন ফলটি ভিটামিন সি এবং নানা রকম খনিজে পূর্ণ। ১০০ গ্রাম পেয়ারায় মাত্র ৫ গ্রাম শর্করা মেলে। তাছাড়া এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও বেশ কম।

আঙুরের বদলে বেদানা : ১০০ গ্রাম আঙুরে ১৬-২০ গ্রাম পর্যন্ত শর্করা মেলে। এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৬০-এর কাছাকাছি। এর বদলে বেদানা খাওয়া যেতে পারে। এতে শর্করার মাত্রা কম, গ্লাইসেমিক ইনডেক্সও কম। এতে মেলে পলিফেনলস-এর মতো অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। প্রদাহের কারণেও ইনসুলিন সেনসিটিভিটি বেড়ে যায়, যা রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়িয়ে দেয়।

আনারসের বদলে পেঁপে : আনারসের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৬৬-৯৪। ফলে আনারস কয়েক টুকরো খেলেই রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত হারে বাড়তে পারে। এর বদলে খাওয়া যেতে পারে পাকা পেঁপে। ভিটামিন সি, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এবং ফাইবারপূর্ণ ফলটি খেতে পারেন ডায়াবেটিস রোগীরা।

ছফেদার বদলে আপেল : রসালো মিষ্টি ছফেদা খেতে ভালো হ'লেও একটি ফলেই শর্করার মাত্রা থাকে অনেক। এই ফলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স ৬৫-৭০। বিশেষত রক্তে শর্করার মাত্রা খুব বেশী থাকলে, এই ফল এড়িয়ে চলা দরকার। ভাত-রুটি খাওয়ার পর তা খাওয়া অনুচিত। এর বদলে নির্দ্বিধায় খেতে পারেন আপেল। এই ফলের গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যেমন কম, তেমনই প্রচুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। ডায়াবেটিসের চিকিৎসকরা বলেন, ডায়াবেটিস রোগীদের খাবারে ফাইবার থাকা খুব যরূরী। কারণ সেটি ছাঁকনির কাজ করে। চট করে রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়তে পারে না।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

রবের পথ

-রবীউল ইসলাম, দিনাজপুর।

ওহে মানব জাতি!
কোথায় তোমার উপকার
কোথায় তোমার ক্ষতি?
তুমি কি জান, স্রষ্টা কেন
সৃষ্টি করেছেন তোমায়?
এত সুন্দর আকৃতি দিয়ে
সুন্দর উপমায়।
বর্তমানে যা করছি আমরা,
যা করা হচ্ছে এ বাংলায়।
এর জন্য মোরা হইনি সৃষ্টি,
আসিনি আমরা এই ধরায়।
স্রষ্টা মোদের পাঠাননি
করতে শুধু উপার্জন,
স্রষ্টা মোদের পাঠিয়েছেন
ইবাদতে কাটাতে জীবন।
রাজত্ব করতে আসিনি আমরা
ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ায়,
জান্নাত মোদের আদি নিবাস
ফিরব সবে সেই ঠিকানায়।
ছোট্ট এই জীবনে সন্তর্পণে হোক মোদের শপথ
শত বাধায়ও ছাড়বো না মোরা রবের দেওয়া পথ।

সৎ সঙ্গ

-মুহাম্মাদ আরাফাত ইসলাম
দিনাজপুর।

সত্য কথা বলি মোরা সৎপথে চলি,
শিরক-বিদ'আতের ভূমিতে মোরা হকের আওয়ায তুলি।
সৎ সঙ্গে জান্নাতে বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ,
সৎ সঙ্গ পেয়ে মোরা অসৎ সঙ্গ ভুলি।
সৎ সঙ্গ আতরওয়ালা বন্ধুর মত হয়,
চারিপাশ যেন সুঘ্রাণে তার সদা সুরভিত রয়।
অসৎ বন্ধু কামারের মত, যত ময়লা-ধোঁয়া,
ধূলা-দুর্গন্ধ, আগুনের তাপ তার কাছে যায় পাওয়া
তাইতো মোরা সৎ মানুষের সঙ্গী হ'তে চাই,
সবকিছু ফেলে সবকিছু ভুলে জান্নাতে যেতে চাই!

আল্লাহ্র নূরে জীবন

-আবূ ইউসুফ রেযওয়ানুল্লাহ

অহি-র আলোয় আলোকিত পথে চলি,
মিথ্যা ছেড়ে সত্য কথা বলি।
ছালাত, ছিয়াম, কুরআনের কথা
শত মুমিনের কর্মগাঁথা,
এসব কিছুই যবান পরে থাকুক দিবা-রাতি
ঘুঁচে যাক যত আঁধার ছড়িয়ে পড়ুক অহি-র জ্যোতি।
আল্লাহ্র পথে কাটাই প্রতিটি ক্ষণ
জানি না তো কবে ফুরিয়ে যায় জীবন,
মুসলিম বলে গর্ব করি
অহি-র আলোয় জীবন গড়ি,
দুনিয়া সে তো ধোঁকার বস্তু, আমলই মূলধন
এই চিন্তা লালন করে আমল করব আমরণ।

হায়াত

-আব্দুল্লাহ, রাজশাহী।

মৃত্যু আমায় প্রতি রাতে
স্মরণ করিয়ে দেয়,
এই দুনিয়ার কয়েদখানায়
কেউ যে আপন নেই।
দুনিয়া হঠাৎ ফুরিয়ে যাবে
পড়ে থাকবে আশা,
কে চলে যায়, কে থাকে ভাই
কে বোঝে কার ভাষা!
জায়গা-জমি ধন-দৌলত
সবই সে তো ধোঁকা,
মৃত্যুর পরে দেখা যাবে
রিক্ত দু'হাত ফাঁকা।
তাই বলি ভাই আমল কর
হায়াত অনেক দামী,
পরকালের ফসল ফলায়
ইহকালের ভূমি।

ছালাত

-মুহাম্মাদ আব্দুল কাইয়ূম
কুলাঘাট, লালমণিরহাট।

চলো চলো সবাই মিলে মসজিদেতে যাই,
হাট-বাজারে আড্ডা দিয়ে কোন ফায়দা নাই।
জামা'আতে ছালাত পড়লে ভালো হবে মন,
ছালাতের গুরুত্ব দিয়ে গড়ি সুন্দর জীবন।
ছালাত হ'ল শ্রেষ্ঠ ইবাদত, রেখো সদা স্মরণ,
ছালাত বিহীন যেন তোমার না হয় গো মরণ।
মর্যাদা তার এত বেশী হিসাবে যায় না বলা,
বহুবার 'ছালাত' বলেন কুরআনে আল্লাহ তা'আলা।
এত আদেশ, এত উপদেশ, তবুও যেন ভাই,
সবকিছু আছে মোদের, শুধুই ছালাত নাই।
তাহ'লে তুমি অপেক্ষায় থাকো মউত ধরবে কষে,
ওয়ায়েল নামক জাহান্নামে যাবে অবশেষে।
হে আল্লাহ! তোমার কাছে করছি মুনাজাত,
নিয়মিত আদায় করতে পারি যেন ছালাত।
চাই রহমত, চাই বরকত, চাই মোরা নাজাত,
পরকালে পাই যেন মোরা সুখময় জান্নাত।

স্বদেশ

সরকার ৩৩ ওষুধের দাম কমিয়েছে এবং আরো ২৬০ প্রকার ওষুধের দাম নির্ধারণ করে দিচ্ছে

অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারী ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান 'এসেনশিয়াল ড্রাগস কোম্পানি লিমিটেড' (ইডিসিএল)। তারপরেও সরকারের সাশ্রয় হবে প্রায় ১১৬ কোটি টাকা। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে এই তথ্য জানান ইডিসিএল-এর এমডি আব্দুছ ছামাদ মৃধা। তিনি বলেন, নানা তৎপরতায় ইতিমধ্যে ট্যাবলেট, ক্যাপসুল, ওরস্যালাইন, ইনজেকশনসহ মোট ৩৩ ধরনের ওষুধের দাম কমানো হয়েছে।

তিনি বলেন, উৎপাদন বাড়াতে এবং প্রতিষ্ঠানকে লাভজনক করতে সিন্ডিকেট ভেঙে দেওয়া, দুর্নীতি দমন এবং প্রায় ৭০০ অপ্রয়োজনীয় কর্মচারী ছাঁটাই করার মতো বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর ফলে উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫৯ কোটি টাকার সমপরিমাণ। কাঁচামাল কেনার দরপত্র উন্মুক্ত করার কারণে প্রতি মাসে প্রায় ১৮ কোটি টাকা সাশ্রয় হচ্ছে।

অন্যদিকে ২৬০টি অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের দাম নির্ধারণ করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকা প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী অধ্যাপক ডা. সায়েদুর রহমান বলেন, অতিরিক্ত মুনাফা নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওষুধ শিল্পের জন্য যে টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে, তাদের তিনটি মূল দায়িত্ব থাকবে। অত্যাবশ্যকীয় ওষুধের তালিকা হালনাগাদ করা, তালিকাভুক্ত ওষুধের মূল্য নির্ধারণ এবং বাকী ওষুধগুলোর জন্য একটি সমন্বিত মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি প্রণয়ন করা। প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান যাতে নৈতিকভাবে মুনাফা করতে পারে, সেদিকেও নযর দেওয়া হবে।

বিদেশ

পাকিস্তান ও ভারতে মেঘের বিস্ফোরণ : আকস্মিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহ রূপ

দক্ষিণ এশিয়ায় সম্প্রতি একাধিক মেঘ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে, যা ভয়াবহ প্রাণহানি ও ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে এনেছে। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনা প্রমাণ করে, কিভাবে মুহূর্তের মধ্যে একটি ছোট এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে। গত আগস্টে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় আকস্মিক মেঘ বিস্ফোরণে ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধস হয়। এতে নিহত হন অন্তত ৩২০ জন, যার মধ্যে শুধু বুনের যেলাতেই ১৫৭ জন প্রাণ হারান। নিখোঁজ ও আহতের সংখ্যাও অনেক।

একই মাসে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীরের কিসওয়ার যেলার চোসিতি গ্রামে মেঘ বিস্ফোরণে বন্যা হয়। এতে অন্তত ৬৫ জন নিহত, ৩০০ জনের অধিক আহত এবং ২০০ জনের বেশী নিখোঁজ হন। এছাড়া উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীতে মেঘ বিস্ফোরণ ও হিমবাহ ভাঙনের ঘটনায় আকস্মিক বন্যা হয়। এতে ৫ জন নিহত এবং ৫০ জনের বেশী নিখোঁজ হন।

মেঘের বিস্ফোরণ কি? মেঘের বিস্ফোরণ হ'ল এমন এক ধরনের বৃষ্টিপাত, যেখানে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অস্বাভাবিকভাবে প্রবল বৃষ্টি হয়। সাধারণত ঘণ্টায় ১০০ মিলিমিটার বা তার বেশী বৃষ্টিপাত হ'লে তাকে মেঘ বিস্ফোরণ ধরা হয়। এর সময়সীমা কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা হ'তে পারে, তবে এর প্রভাব হয় ভয়াবহ।

কেন বা কিভাবে হয়? পাহাড়ি এলাকায় আর্দ্র বাতাস দ্রুত ওপরে উঠে ঠাণ্ডা হয়ে ঘনীভূত হয়। এতে স্বল্প জায়গায় প্রচুর পরিমাণে জলীয়বাষ্প জমা হয়। হঠাৎ করে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট হ'লে এই বিপুল পরিমাণ জলীয়বাষ্প একসঙ্গে প্রচণ্ড বৃষ্টি হিসাবে নেমে আসে, যা দেখে মনে হয় যেন আকাশ ফেটে গেছে।

বাংলাদেশ সমতলভূমি হওয়ায় এখানে ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে কম। তবে পাহাড়ি চট্টগ্রাম এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় এমন ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে আবহাওয়া পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মেঘ বিস্ফোরণের ঘটনা আরও বাড়তে পারে। তাই এই বিষয়ে সচেতনতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়া যরূরী।

ভালো স্বামী বানাতে সেনেগালে কাজ করে যাচ্ছে 'স্কুল ফর হাজবেন্ডস'

জাতিসংঘের উদ্যোগে আফ্রিকার দেশ সেনেগালে চালু রয়েছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী স্কুল, যেখানে পুরুষদের শেখানো হয় কিভাবে একজন সহানুভূতিশীল ও দায়িত্বশীল স্বামী হওয়া যায়। 'স্কুল ফর হাজবেন্ডস' নামের এই স্কুলটি পুরুষদের পারিবারিক সদাচরণে উৎসাহিত করে। এই স্কুলে ইব্রাহীম ডায়ানে নামের এক ইমাম ১৪ জন পুরুষের সামনে হাদীছের বাণী উল্লেখ করে বলেন, 'যে পুরুষ স্ত্রী ও সন্তানদের সহায়তা করে না, সে ভালো মুসলিম নন'। তিনি নিজের সন্তানকে গোসল করানো ও স্ত্রীর গৃহকর্মে সহায়তার অভিজ্ঞতাও শেয়ার করেন।

নারীরা এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এই উদ্যোগের পর তাদের স্বামীদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। শুধু তাই নয়, তাদেরকে ভালো স্বামী বা ভালো পিতা হ'তে অনুপ্রাণিত করেছে। ৫২ বছর বয়সী খারি নডেই বলেন, 'আগে আমার স্বামী শুধু আদেশ করত, এখন তিনি ঘরের কাজে এমনকি রান্নায় সাহায্য করেন।

বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের রহস্যের কি সমাধান হ'ল!

কয়েক দশক ধরে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলকে বিশ্বে অমীমাংসিত রহস্যের একটি ভাবা হচ্ছে। আটলান্টিক মহাসাগরে মায়ামি, বারমুডা ও পুয়ের্তো রিকোবেষ্টিত সমুদ্রের বিস্তৃত অঞ্চল বারমুডা ট্রায়াঙ্গলকে রহস্য হিসাবে ভাবা হয়। ভয় আর নানা জল্পনার বিষয়বস্তুর কেন্দ্রবিন্দুতে আছে এই ট্রায়াঙ্গল। এখানে কোন বিমান বা জাহায প্রবেশ করলে নাকি হারিয়ে যায়। ভিনগ্রহবাসীদের উপস্থিতিসহ নানা ষড়যন্ত্রের প্রসার আছে এ এলাকাকে ঘিরে।

সেসব গল্পকে বৈজ্ঞানিকভাবে উড়িয়ে দেওয়ার কাজ করছেন একদল বিজ্ঞানী। ফলে একে ঘিরে পৌরাণিক কাহিনী আর ধোপে টিকছে না। কারণ পৃথিবীর অন্যান্য সমুদ্রসীমার মতোই প্রায় একই আনুপাতিক হারে নিখোঁজ হওয়ার ঘটনা ঘটে এই এলাকায়। এখানে ঘটনার সংখ্যা বেশি হওয়ার কারণ এই ট্রায়াঙ্গল বিশ্বের ব্যস্ততম জাহায ও বিমান করিডোরের মধ্যে একটি।

বিজ্ঞানী ক্রুজেলনিকির মতে, বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের ভূগোল ও আবহাওয়ার ধরন এমন পরিস্থিতি তৈরি করে, যা অভিজ্ঞ নাবিকদের সামনে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। উপসাগরীয় প্রবাহের মতো একটি শক্তিশালী সমুদ্রস্রোত আর আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন এখানে যেকোন দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। হিংস্র আর বড় ঝড় তৈরি হয় বলে এখানে দুর্ঘটনা ঘটতে বেশী সময় লাগে না। এ ছাড়া অসংখ্য দ্বীপ ও বিপজ্জনক প্রবালপ্রাচীর পুরো পরিস্থিতিকে খারাপ করে দেয়।

সাহিত্যের দুনিয়ায় বারমুডা ট্রায়াঙ্গল শব্দটি প্রথম ১৯৬৩ সালে দেখা যায়। লেখক ভিনসেন্ট গ্যাডিস এ শব্দ প্রবর্তন করেন। ১৯৭৪ সালে লেখক চার্লস বার্লিটজ এ বিষয়ে আরেকটি বই প্রকাশ করলে সর্বাধিক বিক্রীত বই হিসাবে আলোচিত হয়। তখন থেকে বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মিথ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালে বিমানচালক ব্রুস গারনন বারমুডা ট্রায়াঙ্গলের মধ্য দিয়ে উড়ে যাওয়ার সময় একটি অদ্ভুত সুড়ঙ্গের মতো মেঘের মুখোমুখি হওয়ার কথা জানালে মিথ আরও শক্তিশালী হয়।

মুসলিম জাহান

সঊদী আরবের নতুন প্রকল্প : প্রস্তুত করা হচ্ছে রাসূল (ছাঃ)-এর হিজরতের পথে মদীনা যাত্রা পথ

সঊদী আরব, নবী করীম (ছাঃ)-এর মক্কা থেকে মদীনায় ঐতিহাসিক হিজরতের পথকে পুনর্জীবিত করতে 'ইন দ্য প্রোফেটস স্টেপস' নামে একটি বিশেষ প্রকল্প চালু করেছে। এর মাধ্যমে দর্শনার্থীরা আধুনিক প্রযুক্তি ও সুবিধার সাথে মক্কা থেকে মদীনা যাওয়ার সুযোগ লাভ করবেন। সম্প্রতি মদীনার আমীর প্রিন্স সালমান বিন সুলতান উহুদ পাহাড়ের কাছাকাছি স্থানে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেন। এর আওতায় ৪৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ পথের সংস্কার করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩০৫ কিলোমিটার হাঁটার উপযোগী। এই পথে ৪১টি ঐতিহাসিক স্থান, হিজরতের গুরুত্বপূর্ণ ৫টি স্পট, ৮টি স্টেশন এবং একটি 'হিজরত জাদুঘর' রয়েছে। যেগুলো নতুনভাবে সাজানো হয়েছে। ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়গুলো সেখানে দর্শনার্থীদের সামনে তুলে ধরা হবে। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য ৩০টি রেস্তোরাঁ ও ৫০টি দোকান স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় ১২ হাযার মানুষ এটি ভ্রমণ করতে পারবেন।

প্রিন্স সালমানের মতে, এই প্রকল্প ইসলামিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং দর্শনার্থীদের হিজরতের ঐতিহাসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা দেওয়ার একটি প্রচেষ্টা। প্রকল্পটি আগামী নভেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ছয় মাসের জন্য চালু করা হবে।

২০ বছর কোমায় থাকা সঊদী প্রিন্স আল-ওয়ালিদকে মৃত ঘোষণা

অবশেষে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে সঊদী আরবের প্রিন্স আল-ওয়ালিদ বিন খালেদ বিন তালালকে। দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর কোমায় থাকায় পর সম্প্রতি তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ২০০৫ সালে যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে গাড়ি দুর্ঘটনায় আহত হন প্রিন্স আল-ওয়ালিদ। দুর্ঘটনায় তার মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত ও অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ হয়। তখন তার বয়স ছিল ১৫ বছর। তিনি লন্ডনে সামরিক ক্যাডেট হিসাবে পড়াশোনা করছিলেন। আল-ওয়ালিদ দুর্ঘটনার পর থেকেই হাসপাতালে কোমায় ছিলেন। এ কারণে 'দ্য স্লিপিং প্রিন্স' বা 'ঘুমন্ত রাজকুমার' নামেও পরিচিত ছিলেন তিনি।

পাঁচ বছর আগে আল-ওয়ালিদের পরিবারের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক ভিডিওতে দেখা যায়, কোমায় থাকা অবস্থায় তিনি আঙুল নাড়াচ্ছেন। এ থেকে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে আশা করা হচ্ছিল। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও স্পেনের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দীর্ঘ চেষ্টা সত্ত্বেও তার শারীরিক অবস্থার বিশেষ কোনও উন্নতি হয়নি।

গালফ নিউজ জানিয়েছে, ধৈর্য, বিশ্বাস ও পিতা-মাতার অনন্য ভালোবাসার প্রতীক হিসাবে হাযার হাযার মানুষ সামাজিক মাধ্যমগুলোকে আল-ওয়ালিদের মৃত্যুকে স্মরণ করছেন। পুত্রস্নেহের ব্যতিক্রমী এই গল্প মানুষের হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বুলেটপ্রুফ কাঠ উদ্ভাবন করেছেন গবেষকেরা

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকেরা বিশেষ ধরনের কাঠ উদ্ভাবন করেছেন, যাকে 'সুপারউড' বলা হচ্ছে। এই সুপারউড বনের গাছের চেয়ে শক্তিশালী কাঠ হিসাবে কাজ করছে। এই পরিবর্তিত কাঠ ইস্পাতের চেয়েও শক্তিশালী বলে দাবী করা হচ্ছে। ল্যাবে পরীক্ষার সময় গ্যাস বন্দুক দিয়ে কাঠের পাতলা টুকরাতে বুলেট ছোড়া হয়। তখন বুলেটপ্রুফ কাঠ হিসাবে আচরণ করে এই কাঠ। বুলেট সরাসরি প্রাকৃতিক কাঠের মধ্য দিয়ে চলে গেলেও উদ্ভাবিত কৃত্রিম কাঠ ভেদ করতে ব্যর্থ হয়।

ইনভেন্টউড নামের যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্ভাবকেরা এই কৃত্রিম কাঠ তৈরি করেছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যালেক্স লাউ বলেন, উদ্ভাবিত কাঠ সামরিক খাতে প্রয়োগের সুযোগ আছে। যুদ্ধক্ষেত্রের আশ্রয়স্থলে ব্যবহার করা যেতে পারে। নির্মাণশিল্পে কংক্রিটের মতো উপকরণের কারণে গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন হচ্ছে। কাঠভিত্তিক নির্মাণশিল্প আবহাওয়া পরিবর্তনের লড়াইয়ে নতুন বিকল্প হ'তে পারে। শক্তিশালী ও অধিক স্থিতিস্থাপক এই কাঠ দিয়ে আকাশচুম্বী ভবনের কাঠামো তৈরি করা যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

অ্যালেক্স লাউ জানান, কয়েক বছর ধরে ইনভেন্টউডের বিজ্ঞানীরা রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত কাঠের প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করছে। প্রাথমিকভাবে পপলারগাছ থেকে কাঠ ব্যবহার করা হচ্ছে। বাঁশ ব্যবহার করাও সম্ভব বলে জানা গেছে।

সমুদ্রের নিচে গাড়ি চালানো : কল্পনা না বাস্তব?

প্রযুক্তির উৎকর্ষতা মানুষের কল্পনাকে ছুঁতে শুরু করেছে বহু আগে থেকেই। আকাশে উড়ে বেড়ানো যেমন এখন বাস্তব, তেমনি পানির নীচে গাড়ি চালানোও আর নিছক কল্পনা নয়। তবে এই ধারণা পুরোপুরি বাস্তবে রূপ নিয়েছে কি না, তা নিয়ে রয়েছে বিস্ময় আর প্রশ্ন- সমুদ্রের নীচে গাড়ি চালানো কি আদৌ সম্ভব?

হ্যাঁ! বিশ্বের প্রথম পানির নীচে চলতে সক্ষম গাড়ির মতো যান তৈরি করেছে সুইজারল্যান্ডের কোম্পানি রিনস্পীড। তারা তৈরি করেছে এমন গাড়ি, যা পানির নীচে ১০ মিটার পর্যন্ত ডুবতে পারে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানির ওপর ও নীচে চলতে সক্ষম। এতে বৈদ্যুতিক প্রপেলারের মাধ্যমে চালনা করা হয় এবং চালক ও যাত্রী অক্সিজেন মাস্ক ব্যবহার করে শ্বাস নিতে পারে।

সমুদ্রের নীচে সাধারণ গাড়ি চালানো সহজ নয়। কারণ, পানির প্রচণ্ড চাপ গাড়ির কাঠামো ধ্বংস করতে পারে, ইঞ্জিন, ব্যাটারি ও যান্ত্রিক অংশে পানি ঢুকলে গাড়ি বিকল হ'তে পারে, গাড়ির ভাসমান ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ কঠিন, দৃষ্টিসীমা সীমিত হওয়ায় চালনা কঠিন হয়।

সমুদ্রের নীচে গাড়ি চালানো এক সময় ছিল কল্পনা, এখন তা পরীক্ষামূলক বাস্তবতা। ভবিষ্যতে, প্রযুক্তি আরও উন্নত হ'লে হয়তো এ ধরনের যান সাধারণ মানুষও ব্যবহার করতে পারবে। তবে আপাতত এটি রয়ে গেছে বিশেষজ্ঞদের হাতে পরীক্ষার পর্যায়ে।

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

যেলা দায়িত্বশীল ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য প্রশিক্ষণ

১লা ও ২রা আগস্ট শুক্র ও শনিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : গত ১লা ও ২রা আগস্ট শুক্র ও শনিবার রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়াস্থ মারকাযী জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় উদ্যোগে ২২টি সাংগঠনিক যেলার সমন্বয়ে দু'দিন ব্যাপী যেলা দায়িত্বশীল ও কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য প্রশিক্ষণের তৃতীয় পর্ব সমাপ্ত হয়। ইতিপূর্বে ২০ ও ২১শে জুন ২৯টি যেলার সমন্বয়ে উক্ত প্রশিক্ষণের প্রথম পর্ব এবং ৪ঠা ও ৫ই জুলাই ২১টি যেলার সমন্বয়ে দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল সাড়ে ৮-টা থেকে দ্বিতীয় দিন যোহরের পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**।

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, সমাজকল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক দুররুল হুদা, যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার, দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ প্রমুখ। অতঃপর শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সঊদী আরব শাখার সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাই, রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা, 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম ও সোনামণির কেন্দ্রীয় পরিচালক রবীউল ইসলাম।

প্রশিক্ষণ শেষে এম সি কিউ পদ্ধতিতে মূল্যায়ন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১ম পর্বের পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকার করেন আব্দুল ওয়াদূদ (সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা-দক্ষিণ), ২য় স্থান আব্দুস সাত্তার (যুববিষয়ক সম্পাদক, কুমিল্লা) এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন অধ্যাপক শহীদুল করীম (সভাপতি, চাঁপাই-দক্ষিণ)। এছাড়া আরো ২জনকে সম্মাননা পুরস্কার প্রদান করা হয়। যথা- রবীউল ইসলাম (কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, মেহেরপুর) ও রাজীব মিয়া (প্রশিক্ষণ সম্পাদক, মেহেরপুর)।

২য় পর্বে ১ম স্থান অধিকার করেন ক্বামারুয্যামান বিন আব্দুল বারী (সাধারণ সম্পাদক, জামালপুর-দক্ষিণ), ২য় স্থান শাহীদুয্যামান ফারূক (সাংগঠনিক সম্পাদক, সাতক্ষীরা) এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন আব্দুর রহীম (কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, খুলনা)। সম্মাননা পুরস্কার পান মশীউর রহমান (কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য, সাতক্ষীরা) ও মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ, (প্রচার সম্পাদক, সাতক্ষীরা)।

৩য় পর্বে ১ম স্থান অধিকার করেন ডা. আওনুল মা'বূদ (সভাপতি, গাইবান্ধা-পশ্চিম), ২য় স্থান আশরাফ আলী (প্রশিক্ষণ সম্পাদক, নীলফামারী-পূর্ব) এবং ৩য় স্থান অধিকার করেন শফীউল ইসলাম (সহ-সভাপতি, সিরাজগঞ্জ)। সম্মাননা পুরস্কার লাভ করেন আশরাফুল আলম (সাধারণ সম্পাদক, লালমণিরহাট) ও ডা. আমীরুল ইসলাম (সভাপতি, জয়পুরহাট)।

মাসিক ইজতেমা

২২শে জুলাই মঙ্গলবার ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন ধুরইল শাহাজীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি রবীউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ মুর্তাযা, রাজশাহী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি আবুল কাসেম ও উপযেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান প্রমুখ।

৭ই আগস্ট বৃহস্পতিবার মাস্টারবাড়ী, গাযীপুর : অদ্য বাদ মাগরিব গাযীপুর সদর থানার মাস্টারবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাযীপুর-দক্ষিণ সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আব্দুছ ছামাদ, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা তোফায্যল ও পোড়াবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুল মান্নান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'আন্দোলন'-এর সাধারণ পরিষদ সদস্য জনাব আবু ইউসুফ।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

বগুড়ায় ব্যতিক্রমধর্মী দাওয়াতী সফর

৮ই আগস্ট শুক্রবার বগুড়া : অদ্য 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার উদ্যোগে ৮টি মসজিদে জুম'আর খুৎবাসহ সর্বমোট ২৯টি স্থানে দাওয়াতী প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক দাঈ জুম'আর খুৎবার পর বাদ আছর, মাগরিব ও অনেকে বাদ এশা তা'লীমী বৈঠকে বক্তব্য পেশ করেন। উক্ত দাওয়াতী সফরে যেলার সোনাতলা উপযেলার সোনাতলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ ৪টি মসজিদে দাওয়াতী সফর করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম; গাবতলী উপযেলার গোড়দহ পাক মদীনা জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন; ধুনট উপযেলার শিয়ালী চেয়ারম্যানবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম; সারিয়াকান্দি উপযেলার গোসাইবাড়ী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন কেন্দ্রীয় যুববিষয়ক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার; শেরপুর উপযেলার লক্ষ্মীকোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম; শাহজাহানপুর উপযেলার বোহাইল উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন রাজশাহীর নওদাপাড়া মারকাযের শিক্ষক হাফেয আব্দুল মতীন;

সদর উপযেলার সুত্রাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক আব্দুন নূর ও দুপচাচিয়া উপযেলার বেড়ুঞ্জ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদানসহ দাওয়াতী সফর করেন 'যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান।

মারকায সংবাদ

দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

২০শে জুলাই রবিবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : অদ্য বাদ আছর মারকাযী জামে মসজিদে ২০২৫ সালে অত্র মারকায থেকে দাখিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়। মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।**

অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ও মারকাযের পরিচালক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, মারকাযের সেক্রেটারী মাওলানা দুররুল হুদা, মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, মারকাযের গোল্ডেন A+ প্রাপ্ত সাধারণ বিভাগের ছাত্র মুছাদ্দেক হোসাইন ও বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র নাফিয আল-মাহমূদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন তাখাছ্ছুছের ছাত্র আবু রায়হান। অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেক ছাত্রকে মুহতারাম আমীরে জামা'আত লিখিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত তাফসীরুল কুরআন সূরা বাক্বারাহ, সাহিত্যিক মাওলানা আহমাদ আলী, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনে ছাদেকপুর-পাটনা পরিবারের অবদান ও সাড়ে ষোল মাসের কারা স্মৃতি বই উপহার দেওয়া হয়।

২দিন ব্যাপী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

১লা ও ২রা জুলাই মঙ্গল ও বুধবার নওদাপাড়া, রাজশাহী : গত ১লা ও ২রা জুলাই রাজশাহী মাহনগরীর নওদাপাড়াস্থ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মিলনায়তনে ২দিন ব্যাপী অভ্যন্তরীণ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিন সকাল সাড়ে ৯-টা থেকে দ্বিতীয় দিন যোহরের পূর্ব পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব।**

অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব, মারকাযের ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম, মুশরিফ ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক জনাব শামসুল আলম, মহানগর মহাবিদ্যালয়, নওদাপাড়া, রাজশাহীর সহকারী অধ্যাপক (গণিত) ফরীদ আহমাদ, 'ইংলিশ মজা'র পরিচালক জনাব রফীকুল ইসলাম, মারকাযের সহকারী শিক্ষক হাফেয আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ ও সারওয়ার মিছবাহ প্রমুখ।

মৃত্যু সংবাদ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' পাবনা যেলার ঈশ্বরদী উপযেলার প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ বাহারুদ্দীন (৮৪) বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২৯শে জুন রবিবার দিবাগত রাত ১-টা ৪০ মিনিটে নিজ বাড়ীতে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজে'ঊন*। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, ৪ পুত্র ও ২ কন্যাসহ বহু সাংগঠনিক সাথী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। পরদিন দুপুর ২-টায় অত্র উপযেলাধীন দিয়াড় সাহাপুর মসজিদুত তাওহীদ ওয়াস সুন্নাহ প্রাঙ্গনে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় ইমামতি করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ। জানাযা শেষে তাকে মসজিদের পার্শ্ববর্তী সামাজিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। জানাযায় যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সোহরাব আলী, সহ-সভাপতি আলী শাহান মাস্টার, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মাদ ইউনুসসহ যেলা 'আন্দোলন', 'যুবসংঘ' ও 'সোনামণি'র দায়িত্বশীলবৃন্দ এবং বিপুল সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন।

[আমরা তার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি ও শোকাহত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রতিবাদ বিজ্ঞপ্তি

গত ৮ই আগস্ট শুক্রবার রাজধানীর মহাখালীস্থ গাউসুল আজম কমপ্লেক্সে **জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের** আলোচনা সভায় সালাফী, ওহাবী, লা-মাযহাবীদের বিরুদ্ধে সংগঠনের সভাপতি ও দৈনিক ইনকিলাব সম্পাদক এ এম এম বাহাউদ্দীনের বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**। এক যৌথ বিবৃতিতে **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন বলেন, ৯ই আগস্ট শনিবার দৈনিক ইনকিলাবের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত *'মাদরাসার স্বকীয়তা বজায় রাখতে প্রধান উপদেষ্টার হস্তক্ষেপ কামনা'* শীর্ষক রিপোর্টটি আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। সেখানে জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সভাপতি এ এম এম বাহাউদ্দীন এবং মহাসচিব প্রিন্সিপাল শাব্বীর আহমদ মোমতাজীর ভাষণে আমরা দারুণভাবে মর্মাহত হয়েছি। তাদের বক্তব্যে সালাফী, লা-মাযহাবী মতাদর্শের বই বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে নেতৃদ্বয় বলেন, আমরা জানি, জমিয়াতুল মোদার্রেছীন কোন রাজনৈতিক বা মাযহাবভিত্তিক সংগঠন নয়, এটি সারাদেশের মাদ্রাসা শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত একটি কল্যাণমুখী সংগঠন। যেখানে কেন্দ্রীয়, যেলা ও স্থানীয় নেতৃত্বে বহু সালাফী বা আহলেহাদীছ শিক্ষক রয়েছেন এবং সারাদেশে শত শত আহলেহাদীছ শিক্ষক এই সংগঠনের সদস্য রয়েছেন। জনাব বাহাউদ্দীনের ঢালাও মন্তব্যে আহলেহাদীছ শিক্ষক সমাজসহ দেশের অন্যূন চারকোটি আহলেহাদীছের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

তারা বলেন, সালাফী বা আহলেহাদীছ হচ্ছে ধর্মীয় ক্ষেত্রে মূলধারার অনুসারী। যারা রাসূল (ছাঃ)-এর রেখে যাওয়া বিশুদ্ধ দ্বীনের অনুসরণ করেন। চার মাযহাবের ইমামদের সম্পর্কে তাদের সুধারণা রয়েছে এবং তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক আমল করেন। তারা তাক্বলীদ বা অন্ধ ব্যক্তিপূজায় বিশ্বাসী নন। সুতরাং আহলেহাদীছ, সালাফী, ওহাবী, লা-মাযহাবী বলে ঢালাওভাবে বিষোদগার করা আদৌ কাম্য হ'তে পারে না। বিশেষ করে দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে এরূপ কটূক্তি পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ককে বিনষ্ট করবে। বিবৃতিতে তারা অবিলম্বে জনাব এ এম এম বাহাউদ্দীনের উক্ত বক্তব্য প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/৪৪১) : নফল ছিয়াম শুরু করে কোন কারণে ভেঙ্গে ফেললে পরে তার ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব কি?

-মারিয়াম, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তর : নফল ছিয়াম কারণবশত ছেড়ে দিলে তার ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব নয়। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খানা প্রস্তুত করলাম। অতঃপর তিনি এবং তাঁর ছাহাবীগণ আসলেন। যখন খানা পেশ করলাম তখন তাদের মধ্য হ'তে একজন ছাহাবী বললেন, আমি ছায়েম। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমাদের ভাই পরিশ্রম করে খাবার প্রস্তুত করেছে এবং দাওয়াত দিয়েছে। অতএব তুমি ছিয়াম ছেড়ে দাও এবং চাইলে তার স্থানে অন্যদিনে ক্বাযা আদায় করে নিও' *(বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১৯৫২, সনদ হাসান)*। একদিন রাসূল (ছাঃ) একটি পাত্র থেকে কিছু পান করে বাকী অংশ উম্মে হানীকে দিলেন। অতঃপর তিনি তা থেকে পান করে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি তো পান করে ফেললাম, কিন্তু আমি যে ছায়েম ছিলাম! রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার কোন ক্ষতি নেই, যদি তা নফল ছিয়াম হয় *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২০৭৯; ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫৪)*।

হযরত আয়েশা (ছাঃ) বলেন, একদিন নবী করীম (ছাঃ) আমার কাছে আসলেন এবং বললেন, 'তোমাদের কাছে কি কিছু (খাবার) আছে? আমরা বললাম, 'না'। তখন তিনি বললেন, তাহ'লে আমি এখন ছিয়াম পালন করছি (নফল ছিয়াম)। পরে আরেকদিন তিনি আমাদের কাছে আসলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের জন্য হাইস (এক ধরনের আরবীয় খাবার) হাদিয়া এসেছে। তিনি বললেন, আমাকে তা দেখাও, আমি আজ সকালে ছিয়ামের নিয়ত করেছিলাম। অতঃপর তিনি তা খেয়ে ফেললেন' *(ছহীহ মুসলিম হা/১১৫৪; মিশকাত হা/২০৭৬)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (ছাঃ) বললেন, নফল ছায়েম নিজের উপর 'আমীর' অর্থাৎ কর্তৃত্বশীল। চাইলে রাখতে পারে, চাইলে ভাঙতে পারে' *(হাকেম, ছহীহুল জামে' হা/৩৮৫৪)*। উল্লেখ্য, নফল ছিয়াম ভেঙ্গে ফেললে ক্বাযা আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আবুদাঊদ হা/২৪৫৭; যঈফাহ হা/৫২০২)*।

প্রশ্ন (২/৪৪২) : আমরা 'লাইফ লাইন ফাউন্ডেশন' নামে একটি সমিতি করে ২৩ জন প্রতিমাসে ১০০০ টাকা করে জমা করি। সেই টাকা দিয়ে আমরা সমাজের বিভিন্ন মানুষকে পণ্য কিনে দেই। ক্রেতা কিস্তিতে কিছু লাভ সহ মূল্য পরিশোধ করে। আমাদের কোন নিজস্ব দোকান নেই। এরূপ করা জায়েয হবে কি?

*-*রুমন মিয়া, রাজেন্দ্রপুর, গাযীপুর।*

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : উক্ত পদ্ধতিতে ব্যবসা করা জায়েয হবে না। কারণ এতে এমন পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে, যা নিজের মালিকানায় নেই। ব্যবসার ক্ষেত্রে যরূরী শর্ত হচ্ছে- (১) মালিকানা এমনভাবে সাব্যস্ত হওয়া, যাতে কোন প্রকার ধোঁকা, প্রতারণা, অপকৌশল না থাকে। (২) পণ্য হস্তগত হওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বস্তু ক্রয়ের পর তা নিজ মালিকানায় নিয়ে আসার পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন *(মুসলিম হা/৩৯১৬, ৩৯২৫)*। হাকীম ইবনু হিযাম (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে এমন জিনিস বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন, যা আমার কাছে নেই' *(তিরমিযী হা/১২৩২)*। অন্য বর্ণনায় আরও এসেছে, 'আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! কেউ আমার কাছে আসে এবং কিছু জিনিস ক্রয় করতে চায়, অথচ তা আমার কাছে থাকে না, আমি তখন বাজার থেকে তা কিনে এনে তাকে বিক্রি করি। তিনি বললেন, তোমার কাছে নেই এমন জিনিস বিক্রি করো না' *(আবুদাঊদ হা/৩৫০৩; মিশকাত হা/২৮৬৭; ছহীহুল জামে' হা/৭২০৬)*। উপরোক্ত পদ্ধতির ব্যবসায় উক্ত শর্তগুলো বিদ্যমান না থাকায় তা জায়েয নয়।

প্রশ্ন (৩/৪৪৩) : আমি কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে জমি ইজারা নিয়ে ফসল করছি। এক্ষণে আমি টাকার উপরে যাকাত দিব না কেবল ওশর দিলেই চলবে?

-মামূন, নাটোর।

উত্তর : টাকার উপর নয় বরং উৎপাদিত ফসলের উপর যাকাত (ওশর) দিতে হবে। ইমাম রাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'মালিকানাধীন জমি ও ইজারা (ভাড়ায় নেওয়া) জমিতে উৎপন্ন ফসলের ক্ষেত্রে ওশরের (ফসলের যাকাত) বিধানে কোন পার্থক্য নেই। তেমনি যেমন কেউ যদি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কোন দোকান ভাড়া নেয়, তার উপর দোকানের ভাড়া দেওয়া ও ব্যবসার যাকাত উভয়ই ওয়াজিব হয়' *(আশ-শারহুল কবীর ৫/৫৬৬)*। ইমাম ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন জমি ভাড়া নেয় এবং তা চাষ করে, তখন তার উপর ফসলের ওশর (যাকাত) আবশ্যক হবে, জমির মালিকের উপর নয়' *(আল-মুগনী ৩/৩০)*।

তবে কেউ ঋণ করে ফসল উৎপাদন করে থাকলে ঋণ পরিশোধ করার পর অবশিষ্ট ফসলের ওশর দিতে হবে মর্মে ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর (রাঃ) এবং কতিপয় তাবেঈ ও ইমামের অভিমত রয়েছে। ইবনে ওমর (রাঃ) ও ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণিত আছে, যে তার ফল (ফসল) উৎপাদনের জন্য ব্যয় করে। তাদের মধ্যে একজন বলেছেন, সে পুরো ফলের যাকাত (ওশর) আদায় করবে। অন্যজন বলেছেন, 'ব্যয়কৃত অংশ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অংশ থেকে যাকাত (ওশর) আদায় করবে' *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/১০০৯৬)*। ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, সে যা ঋণ নিয়েছে, তা দিয়ে শুরু করবে (অর্থাৎ আগে ঋণ পরিশোধ

করবে), এরপর যা বাকী থাকবে, তা থেকে যাকাত আদায় করবে' *(বায়হাক্বী, সুনানুল কুবরা হা/৭৬০৮; ইয়াহইয়া ইবনু আদম, আল-খারাজ হা/৫৮৯, সনদ ছহীহ)*। ইমাম আহমাদ (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি তার ফসলের (চাষাবাদের) উপর খরচ করার জন্য ঋণ গ্রহণ করেছে, সে তার ফসলের জন্য ব্যয়কৃত অংশ হিসাব করবে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৩/৩০)*। অর্থাৎ ফসল উৎপাদনের জন্য ঋণ করে থাকলে ঋণ পরিশোধ করার পর বাকী অংশের উপর ওশর প্রদান করবে।

প্রশ্ন (৪/৪৪৪) : আমি সুস্থতার নিয়তে প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা ফাতিহা পড়ে পুরো শরীর মাসাহ করি এবং উপকৃত হই। এরূপ করা জায়েয হবে কি?

*-*রনি, ঢাকা।*

**[আরবীতে সুন্দর ইসলামী নাম রাখুন (স.স.)]*

উত্তর : কেউ যদি এটাকে সুন্নাত মনে না করে বরং অসুস্থ থাকলে মাঝে মধ্যে আমল করে তাহ'লে এই আমলটি রুকইয়ার নিয়তে জায়েয হবে *(বিন বায, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ১/৩৩২)*। কারণ ছাহাবী ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'অনুসরণ কর, নতুন কিছু আবিষ্কার কর না, তোমাদের জন্য শরী'আতই যথেষ্ট' *(দারেমী হা/২০৫; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/৮৫৩)*। তবে অসুস্থ অবস্থায় সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ পাঠের পর শরীর মাসাহ করা এবং ঘুমানোর পূর্বে উক্ত সূরাগুলো তিনবার পাঠ করে শরীর মাসাহ করার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে *(বুখারী হা/৫০১৭)*।

প্রশ্ন (৫/৪৪৫) : ব্যবসার জন্য আমি একজনের নিকট থেকে কিছু টাকা ঋণ নিব। কিন্তু আমি জানি তার উপার্জিত অর্থ হারাম। তবে সে বিনা সূদেই আমাকে ঋণ দিবে। এটা নেয়া জায়েয হবে কি?

-শাহেদ, ঢাকা।

উত্তর : যদি নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে পুরো অর্থ হারাম উৎসের, তাহ'লে ঐ টাকা ঋণ নেওয়া জায়েয নয়। কিন্তু যদি তার আয়ের মধ্যে হালাল ও হারামের সংমিশ্রণ থাকে, তাহ'লে ঋণ গ্রহণ করা জায়েয হবে। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'যদি কেউ নির্দিষ্টভাবে কোন ব্যক্তির সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়ে নেয় (চুরি-ডাকাতির মাধ্যমে) এবং সেটা কাউকে বিক্রি করতে চায় বা উপহার দিতে চায়, তাহ'লে এটি হারাম, কারণ এই সম্পদটি নিজেই হারাম অর্থাৎ সত্ত্বাগতভাবে নিষিদ্ধ। কিন্তু এমন উপার্জন যা সূদ, প্রতারণা বা অনুরূপ অবৈধ পন্থায় অর্জিত সেটা উপার্জনকারীর জন্য হারাম, কিন্তু কেউ যদি ন্যায্যভাবে (বৈধ চুক্তি বা প্রয়োজনে) সেই অর্থ গ্রহণ করে, তাহ'লে তার জন্য তা হারাম নয়। *(উছায়মীন, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/১৭৮)*।

প্রশ্ন (৬/৪৪৬) : পুলছিরাত সহজে পার হওয়ার জন্য বিশেষ কোন আমল আছে কী?

-গোলাম রাব্বি, বরিশাল।

উত্তর : পুলছিরাত সহজে পার হওয়ার জন্য নিম্নের আমলসমূহ করা যায়। যেমন- ১. নিয়মিত জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা *(মুসলিম হা/২২৩)*। ২. গোপনে ছাদাক্বা করা *(তিরমিযী হা/৬১৪, সনদ ছহীহ)*। ৩. আল্লাহ্র যিকরে জিহ্বা সিক্ত রাখা *(ছহীহুত তারগীব হা/১৫০৯)*। ৪. আত্মীয়তার সম্পর্ক ও আমানত রক্ষা করা। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'তখন 'আমানত' ও 'রেহেম'কে (রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়তার সম্পর্ক) পাঠানো হবে। তারা দাঁড়িয়ে যাবে ছিরাতের দুই পার্শ্বে ডান ও বামে। তারপর তোমাদের কেউ সেতুটি অতিক্রম করবে বিদ্যুতের ন্যায় দ্রুত গতিতে *(মুসলিম হা/১৯৫)*। ৫. ছিয়াম পালন করা ও কুরআন তেলাওয়াত করা *(ছহীহুত তারগীব হা/৯৮৪, ১৪৩৪)*। ৬. এছাড়া নিয়মিত ওযূ করা *(মুসলিম হা/২৪৬)*। ৭. রাতের অন্ধকারে মসজিদে গমন করা *(ছহীহুল জামে' হা/২৮২৩)*। ৮. তাহাজ্জুদের ছালাত আদায় করা *(ইবনু আবিদ্দুনিয়া, আত-তাহাজ্জুদ ওয়া ক্বিয়ামুল লায়ল পৃ. ২৮০)*। ৯. সূরা বাক্বারাহ তেলাওয়াত করা, বিশেষত শেষ দুই আয়াত *(মুসলিম হা/৮৬০)*। ১০. সূরা কাহফ তেলাওয়াত করা *(ছহীহাহ হা/২৬৫১)*। ১১. ইসলামের উপর বার্ধক্যে উপনীত হওয়া *(ছহীহাহ হা/১২৪৪)*।

প্রশ্ন (৭/৪৪৭) : জনৈকা মহিলা ঢাকায় থাকে এবং তার স্বামী রাজশাহীতে চাকুরী করে ও সেখানেই থাকে। মহিলা মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে গিয়ে ৩/৪ দিন থাকে। এসময় সে ছালাত ক্বছর করতে পারবে কি?

-মুহিব আযীয, মিরপুর, ঢাকা।

উত্তর : যে জায়গায় ব্যক্তি স্থায়ীভাবে বসবাস করে সেটিই তার স্থায়ী বাসস্থান হিসাবে গণ্য হবে। অতএব উক্ত স্ত্রী যদি স্বামীর নিকট ৩/৪ দিন অবস্থান করে তবে সে মুসাফির হিসাবেই গণ্য হবে এবং ছালাত ক্বছর করতে পারবে *(ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২১৭; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ২৩/৫৮; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/১৪৭)*।

প্রশ্ন (৮/৪৪৮) : এটিএম বুথের জন্য জায়গা ভাড়া দেওয়া যাবে কি?

-বাবুল আখতার, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : কোন সূদী ব্যাংকের এটিএম বুথ করার জন্য জায়গা ভাড়া দেয়া জায়েয হবে না। কেননা এর মাধ্যমে সরাসরি সূদী লেনদেনে সহযোগিতা করা হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, 'সৎকর্ম ও আল্লাহ্ভীতিতে একে অন্যকে সাহায্য কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে একে অন্যকে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তিদাতা' *(মায়েদাহ ৫/২)*। জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) সূদ গ্রহীতা, সূদদাতা, সূদের লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেন, তাদের সকলের পাপ সমান *(মুসলিম হা/১৫৯৮)*।

প্রশ্ন (৯/৪৪৯) : জেনেশুনে বেনামাযী ব্যক্তির জানাযার ছালাত আদায় করলে জানাযার ছওয়াব পাওয়া যাবে কি?

-মীযানুর রহমান ভূইয়াঁ, ময়মনসিংহ।

উত্তর : যদি কেউ ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকার না করে, বরং গাফিলতি, অলসতা বা দুনিয়াবী ব্যস্ততার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত আদায় না করে, তাহ'লে সে কবীরা

গোনাহগার হ'লেও মুসলমান হিসাবে গণ্য হবে। এ অবস্থায় তার জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে এবং যারা জানাযার ছালাতে অংশ নেবে, তারা ছওয়াব পাবে। কিন্তু যদি কেউ ছালাতের ফরযিয়াতকে অস্বীকার করে তাহ'লে সে শরী'আতের দৃষ্টিতে কাফের বা মুরতাদ বলে গণ্য হবে। এমন ব্যক্তির জানাযার ছালাত আদায় করা জায়েয নয়। কেউ পড়লেও তা শরী'আত সম্মত হবে না এবং তাতে কোন ছওয়াবও পাওয়া যাবে না *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন 'আলাদ-দারব ৯/২; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৭/১১৫)*।

প্রশ্ন (১০/৪৫০) : আমার অনার্স পরীক্ষা শুরু হয় দুপুর ২-টায় এবং শেষ হয় ৬-টায়। সেক্ষেত্রে আমি পরীক্ষার পূর্বে যোহর ও আছরের ছালাত জমা করে নেই। এভাবে ছালাত আদায় জায়েয হবে কি?

-এনামুল নাঈম, দিনাজপুর সরকারী ডিগ্রি কলেজ।

উত্তর : এভাবে ছালাত আদায় করা জায়েয। দু'টি ছালাত, যেগুলোর মাঝে শরী'আতে জমা' (একত্রে পড়া) করার অনুমতি আছে, পরীক্ষার কারণে সেগুলোর মধ্যে জমা' তাক্বদীম বা জমা' তাখীর করা জায়েয। কারণ এটি হাজত বা বিশেষ প্রয়োজনে করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় অবস্থানকালে (কোন সফর ছাড়া) ভয় বা বৃষ্টির কারণ ছাড়াই যোহর ও আছর এবং মাগরিব ও এশার ছালাত একত্রে আদায় করেছেন। রাবী বলেন, আমি ইবনু আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কেন? তিনি বললেন, উম্মতের উপর যেন কষ্ট না হয় *(মুসলিম হা/৭০৫; দ্র. ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) 'সফরের ছালাত' অধ্যায়, 'ছালাত জমা ও ক্বছর করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১১/৪৫১) : আমাদের মসজিদে পুরুষদের শেষ কাতার থেকে ১৫ থেকে ২০ ফিট পিছনে মহিলাদের জুম'আর ছালাত আদায়ের ঘর করা হয়েছে। এক্ষণে মাঝখানে তিন-চার কাতার স্থান খালি রাখলে ছালাত আদায় হবে কি?

-ফযলুল করীম, ঢাকা।

উত্তর : নারীদের জন্য কাতার থেকে সঙ্গত দূরত্বে অবস্থান করে জামা'আতে ছালাত আদায় করা জায়েয, যদি তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে ইমামের আওয়াজ পৌঁছে এবং তারা ইমামের অনুসরণে ছালাত আদায় করতে পারে। চাই এটা সরাসরি ইমামের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে হোক অথবা মাইক বা লাউড স্পিকারের মাধ্যমে কিংবা মুকাব্বিরের মাধ্যমে হোক *(উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৫/২১১)*।

প্রশ্ন (১২/৪৫২) : কোন ব্যক্তি যদি অনুতপ্ত হয়ে ব্যাংক থেকে গৃহীত সূদের টাকা ফেরত দিতে চায় তথা জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করতে চায়। তবে একসাথে সম্পূর্ণ টাকা ব্যয় করার সামর্থ্য না থাকায় অল্প অল্প করে ব্যয় করতে চায়। এরূপ পদ্ধতিতে সূদমুক্ত হওয়া সঠিক হবে কি?

-আবু হুরায়রা ছিফাত, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সূদমুক্ত হওয়া সঠিক হবে ইনশাআল্লাহ। এক্ষেত্রে প্রথমে সূদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে। অতঃপর খালেছ নিয়তে তওবা করতে হবে এবং এর সাথে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট না হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

প্রশ্ন (১৩/৪৫৩) : আমার মা আমাদের একটা গরু অসুস্থ হ'লে মানত করে যে, এটি ভালো হ'লে কুরবানী দিবে। এখন আর্থিক সমস্যার কারণে তা বিক্রি করতে চাচ্ছে। এভাবে আর্থিক সমস্যার কারণে মানতের গরু বিক্রি করা জায়েয হবে কি?

-আব্দুল ক্বাইয়ূম, বগুড়া।

উত্তর : কেউ কোন পশু কুরবানী করার মানত করলে তা তাকে পালন করতে হবে। অন্যথায় গোনাহ হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র আনুগত্যমূলক কোন কাজের মানত করে, সে যেন তা পালন করে; আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র অবাধ্যতামূলক কোন কাজের মানত করে, সে যেন তা পালন না করে' *(বুখারী হা/৬৬৯৬; মিশকাত হা/৩৪২৭)*। এক্ষণে আর্থিক সমস্যার কারণে মানত পূরণে অক্ষম হ'লে মানত ভঙ্গের কাফফারা আদায় করতে হবে *(মুগনী ১০/১১)*। আর মানতের কাফফারা সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, 'তোমরা দশজন দরিদ্রকে খাদ্য প্রদান করবে মধ্যম মানের খাদ্য, যা তোমরা স্বীয় পরিবারকে দিয়ে থাক অথবা তাদেরকে বস্ত্র প্রদান করবে অথবা একজন ক্রীতদাস কিংবা দাসী আযাদ করে দিবে। যে ব্যক্তি সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন ছিয়াম পালন করবে। এটা তোমাদের শপথের কাফফারা, যখন তোমরা শপথ করবে' *(মায়েদাহ ৫/৮৯)*।

প্রশ্ন (১৪/৪৫৪) : আমার মাসিক আয় সীমিত (প্রায় ৫,০০০ টাকা) এবং তা দিয়ে আমার নিজের চলাই কঠিন। আমার পিতা আর্থিকভাবে সচ্ছল হওয়া সত্ত্বেও আমার কাছে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা দাবী করছেন। আমার নিজের প্রয়োজন মেটাতে হিমশিম খাওয়ায় আমি এই টাকা দিতে পারছি না। এমতাবস্থায় আমি কি পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান হিসাবে গণ্য হব? তাছাড়া ভবিষ্যতে আয় বাড়লে পিতা-মাতা যা চাইবেন, সন্তান কি তা দিতে বাধ্য থাকবে?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : পিতা-মাতা স্বাবলম্বী হ'লে তাদের প্রতি খরচ করা ওয়াজিব নয়। শায়েখ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'পিতা-মাতা ও দাদা-দাদীর জন্য ভরণপোষণ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত হ'ল তারা অভাবী হন, এবং সন্তান সচ্ছল হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি নিজের থেকে শুরু কর, নিজেকে দান কর; তারপর যদি কিছু অতিরিক্ত থাকে, তা তোমার পরিবারের জন্য; এরপরেও কিছু অতিরিক্ত থাকলে তা আত্মীয়দের জন্য' *(মুসলিম হা/৯৯৭; মিশকাত হা/৩৩৯২)*। অতএব পিতা-মাতা যদি অভাবগ্রস্ত হন এবং ছেলের কাছে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থাকে, তাহ'লে ছেলের উপর পিতা-মাতার প্রয়োজন অনুসারে সাধ্যমত খরচ করা কর্তব্য।

প্রশ্ন (১৫/৪৫৫) : আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে, নিজ সন্তানের আক্বীক্বার গোশত পিতা-মাতার জন্য খাওয়া জায়েয নয়। একথা সঠিক কি?

-রাবেয়া সুলতানা, রাজারহাট, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : উক্ত প্রথা সঠিক নয়। আক্বীক্বার গোশত পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, গরীব-মিসকীন সকলে খেতে পারে। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'আক্বীক্বার গোশত থেকে নিজে খাওয়া, অন্যের জন্য উপহার দেওয়া ও দরিদ্রদের জন্য ছাদাক্বা করা মুস্তাহাব *(আল-মাজমূ' ৮/৪২৭)*। ইবনু কুদামাহ (রহঃ) বলেন, আক্বীক্বার গোশত নিজে খাবে, অন্যদের খাওয়াবে ও দরিদ্রদের জন্য ছাদাক্বা করবে *(মুগনী ৯/৪৬৩)*।

প্রশ্ন (১৬/৪৫৬) : পিতা মারা যাওয়ার পর মামারা আমার আম্মুর দেখাশোনা করেন, বিয়ে দেন এবং বিয়ের সময় স্বেচ্ছায় একটি ঘর নির্মাণ করে দেন। পরবর্তীতে আম্মু ১০ হাযার টাকা ধার নেন, যা পরিশোধ করা হয়নি। এখন এই খরচের অজুহাতে মামারা আম্মুর পৈতৃক সম্পত্তির প্রাপ্য অংশ (প্রায় ৩ বিঘা) দিচ্ছেন না। তারা বলছেন যে, বিয়ের খরচ ও লালন-পালনের বিনিময়ে তারা জমি দিবেন না। এমতাবস্থায় আম্মুর জমির অধিকার বাতিল হয়ে যাবে কি? আমাদের পক্ষ থেকে সেই জমি দাবী করা জায়েয হবে কি?

-আহসান হাবীব, যশোর।

উত্তর : মেয়ের পৈতৃক সম্পত্তি তার নিজস্ব সম্পদ। এক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা মেয়েরই। এই অংশ থেকে স্বাভাবিকভাবে বঞ্চিত করা যাবে না, যদি না মেয়ে স্বেচ্ছায় তা ছেড়ে দেয়। এক্ষণে বোনকে লালন-পালন এটি তার প্রতি ভাইদের ইহসান এবং তাদের পক্ষ থেকে এ কাজ আল্লাহ্র নিকট নেক আমল হিসাবে গণ্য হবে। তবে এই কাজের বিনিময়ে বোনের প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার শারঈ বা আইনগত অধিকার নেই, যদি না এ ব্যাপারে কোন লিখিত চুক্তি বা স্বীকৃতি থাকে। অপরদিকে ধারের ১০ হাযার টাকা ভাইদের ফেরত দিবে। সেই সাথে প্রমাণ সাপেক্ষে মায়ের পৈত্রিক সম্পত্তির বৈধ উত্তরাধিকারী হিসাবে সন্তানেরাও দাবী করতে পারবে *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪৫/২০২-২০৩)*।

প্রশ্ন (১৭/৪৫৭) : হজ্জ পালনের ব্যাপারে পিতা কোন অছিয়ত করে যাননি। সে সময়ে তার সামর্থ্যও ছিল না। এক্ষণে সন্তানের সামর্থ্য থাকলে মৃত পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করা যাবে কি?

-আলমগীর মাহমূদ ইউসুফ, কাহারোল, দিনাজপুর।

উত্তর : মাইয়েতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা যাবে। ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'একজন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমার পিতা হজ্জ না করে মারা গেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করব? তিনি বললেন, তুমি কী মনে কর যে, তোমার পিতার উপর যদি ঋণ থাকত, তাহ'লে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ কর' *(নাসাঈ হা/২৬৩৯; ইবনু হিব্বান হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/৩০৪৭)*। আব্দুল্লাহ ইবনু বুরায়দাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় এক মহিলা তার কাছে এসে বলল, আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম, আমার মা মারা গেছেন। তখন তিনি বললেন, তুমি তোমার ছওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছ এবং ঐ দাসী উত্তরাধিকার সূত্রে পুনরায় তোমার মালিকানাধীনে ফিরে আসবে। সে (মহিলা) আবার বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তার এক মাসের ছিয়াম বাকী আছে। আমি কি তার পক্ষ থেকে এ ছিয়াম পালন করতে পারি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তার পক্ষ থেকে তুমি ছিয়াম পালন কর। আবার সে বলল, তিনি কখনো হজ্জ করেননি। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করব? তিনি বললেন, তার পক্ষ থেকে হজ্জও আদায় কর' *(মুসলিম হা/১১৪৯)*।

প্রশ্ন (১৮/৪৫৮) : বর্ষা মৌসুমে বিলে পানি বেড়ে যাওয়ায় পুকুরের মাছ ভেসে যায়। কিছুদিন পর পানি নেমে গেলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। গ্রামের শত শত লোক তখন জমির মালিকদের অনুমতি ছাড়াই মাছ ধরে খায়। যুগ যুগ ধরে সমাজে এটা চলে আসছে। এভাবে মাছ ধরা জায়েয হবে কি?

-আবু মুহাম্মাদ, কক্সবাজার।

উত্তর : এই প্রথা সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হ'লে লোকেরা মাছ ধরে খেতে পারে। কারণ সমাজে প্রচলিত পন্থাগুলো শরী'আত বিরোধী না হ'লে শরী'আত সেগুলোকে বাতিল করে না। ইবনু আবেদীন বলেন, 'সামাজিকভাবে স্বীকৃত বিষয় (عرف) শর্তযুক্ত বিষয়ের মতো গণ্য, আর যা প্রচলিত প্রথা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত *(আব্দুল ওয়াহহাব খাল্লাফ, ইলমু উছূলিল ফিক্বহ পৃ. ৯০)*। সুতরাং কারো পুকুরের মাছ যখন অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে তখন তা আর নির্দিষ্ট মালিকানায় থাকে না। এরূপ অবস্থায় লোকেরা মাছ ধরে খেতে পারে। কিন্তু যদি পাশের পুকুরে বা জায়গায় চলে যায় এবং পার্থক্য করা যায় যে, এটি পার্শ্ববর্তী মালিকের; তাহ'লে তাকে অবহিত করে যথাসম্ভব ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন (১৯/৪৫৯) : জনৈকা নারীকে জোরপূর্বক অস্ত্র ঠেকিয়ে বিবাহে বাধ্য করা হয়। পরিবারের নিরাপত্তার কথা ভেবে স্ত্রী চুপ ছিল। সরকার পরিবর্তনের সুযোগে স্ত্রী গোপনে কোর্টের মাধ্যমে স্বামীকে ডিভোর্স দেয় এবং অন্য একটা ছেলেকে বিবাহ করে। গত প্রায় একবছর ডিভোর্স দেয়া স্বামীর সাথে কোন শারীরিক সম্পর্ক নেই। কিছুদিন পর ১ম স্বামী নিজ থেকেই তাকে তালাক দেয়। এক্ষণে গোপনে করা বিবাহটা জায়েয হয়েছে কি?

-ফারূক, চট্টগ্রাম।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় খোলা' হয়েছে। খোলা' তথা বিবাহ বিচ্ছেদ যা নারীর পক্ষ থেকে হয়, স্বামী থেকে মোহর বা মোহরের অংশবিশেষ ফিরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে *(ইবনু কুদামাহ, মুগনী ৮/১৮১)*। এক্ষণে স্ত্রী এক ঋতু পর্যন্ত ইদ্দত পালন শেষে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হ'তে পারবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৩/১৫৩)*। এক্ষেত্রে পরবর্তী বিবাহ যদি এক হায়েয ইদ্দত পালন শেষে হয়ে থাকে এবং বৈধ অভিভাবকের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে, তাহ'লে সেটি বৈধ হয়েছে। আর এগুলো না থাকলে বিবাহ বৈধ হয়নি

(তিরমিযী হা/১১০২; মিশকাত হা/৩১৩১)। সেক্ষেত্রে তওবা করে নতুনভাবে বিবাহ করতে হবে।

প্রশ্ন (২০/৪৬০) : শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি স্বরূপ আর্থিক জরিমানা আদায় করা যাবে কি?

-আল-আমীন, নাটোর।

উত্তর : যে সকল দেশে ইসলামী আইন চালু নেই এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিভিন্ন সংস্থা বা কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হয়, সে সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শৃংখলার স্বার্থে বিভিন্ন অনিয়মে জড়িয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের আর্থিক জরিমানা করতে পারে। তবে সেটা যেন কারো প্রতি যুলুম না হয় সেদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, আল-হিসবাতু ফিল ইসলাম ১/৪৯; ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা ১২/৩০৭; ইবনুল হুমাম, ফাৎহুল কাদীর ৫/৩৪৫)*।

প্রশ্ন (২১/৪৬১) : বিজিবিতে কর্মরত জনৈক ভাই ঘুষের মাধ্যমে চাকরি পেয়েছেন এবং চাকরিরত অবস্থায় বিভিন্ন শিরক ও বিদ'আত যেমন- দিবস পালন, পতাকাকে সম্মান, মীলাদ ইত্যাদি কাজের সাথে আপোষ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এছাড়া কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে তিনি সময়মতো ছালাত আদায় করতে পারেন না। এমতাবস্থায় উক্ত চাকরী করা জায়েয হবে কি?

-তাওহীদুল ইসলাম, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমত নিজের বৈধ অধিকার রক্ষার্থে বাধ্যগত অবস্থায় ঘুষ প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণকারী পাপী হবে, দাতা পাপী হবে না ইনশাআল্লাহ। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, 'যদি কেউ অন্য একজনকে উপহার দেয় এই উদ্দেশ্যে যে, সে যেন তার উপর যুলুম না করে অথবা তার প্রাপ্য হক তাকে দিয়ে দেয় তাহ'লে এই উপহার গ্রহণ করা গ্রহীতার জন্য হারাম হবে, কিন্তু দাতার জন্য তা দেওয়া বৈধ হবে। রাসূলুল্লাহ বলেন, 'আমি কখনো কাউকে কিছু দেই, অথচ সে তা নিয়ে বেরিয়ে যায় আর সেটা তার জন্য আগুন হয়ে যায়। জিজ্ঞেস করা হ'ল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! তাহ'লে আপনি তাদেরকে দেন কেন? তিনি বললেন, 'তারা তো চাওয়া ছাড়া থাকতেই চায় না, আর আল্লাহ তা'আলা আমাকে কৃপণতা করতে পসন্দ করেন না' *(আহমাদ হা/১১১৩৯; ছহীহুত তারগীব হা/৮৪৪)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, আর যে ঘুষের মাধ্যমে মানুষ নিজের হক আদায় করে যেমন এমন পরিস্থিতি যেখানে সে অর্থ না দিলে তার হক আদায় সম্ভব নয় তাহ'লে এই ঘুষ গ্রহীতার জন্য হারাম, কিন্তু দাতার জন্য হারাম নয়। কারণ দাতা কেবল নিজের প্রাপ্য হক আদায়ের জন্যই অর্থ দিয়েছে। তবে যে এই ঘুষ গ্রহণ করেছে সে গোনাহগার হবে, কেননা সে এমন কিছু নিয়েছে যার সে হকদার নয় *(ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৪/৩০২)*। দ্বিতীয়ত বিভিন্ন দিবস পালন ও বিদ'আতী কর্মে জড়িত হওয়া গোনাহের কাজ এবং পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। যা থেকে সাধ্যমত বিরত থাকার চেষ্টা করতে হবে *(নাহল ১০৬)*। তৃতীয়ত ছালাত সময়মত আদায় করতে হবে। ছালাতের সময় নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলে যখন সময় পাবে তখনই ছালাত আদায় করে নিবে *(মুসলিম হা/৬৮০)*। যদি কোনটিই সম্ভব না হয় তবে প্রয়োজনে দ্বীন রক্ষার স্বার্থে চাকুরী পরিত্যাগ করে হালাল রূযীর পথ তালাশ করবে *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

প্রশ্ন (২২/৪৬২) : আমার নিকট কিছু টাকা থাকায় আমি মানুষকে ঋণ দিয়ে ছওয়াব অর্জন করতে চাই। কিন্তু মানুষের অভ্যাস খারাপ হওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যারা ঋণ পরিশোধ করবে না তাদের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জরিমানাও নির্ধারণ করতে চাই? এই পদ্ধতি গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-সাদমান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : কোন শর্ত দিয়ে ঋণ প্রদান করলে তা সূদ হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং সময়ের বিপরীতে জরিমানা নির্ধারণ করা যাবে না। যদি ঋণদাতা ঋণগ্রহীতার ওপর এই শর্ত আরোপ করে বা তাকে বাধ্য করে যে, নির্ধারিত সময়ের পরে ঋণ পরিশোধ করলে তাকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা নির্দিষ্ট হারে জরিমানা দিতে হবে, তাহ'লে এটি একটি বাতিল ও হারাম শর্ত। এই শর্ত পূরণ করা আবশ্যক নয়; হোক না এই শর্ত আরোপকারী ব্যাংক বা অন্য কেউ। কেননা এটি সেই জাহেলিয়াতের রিবা বা সূদ যার নিষেধাজ্ঞা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে *(আল-ফাতাওয়া আল-ইকতিছাদিয়া পৃ. ৭৩)*। বরং ঋণগ্রহীতাকে অতিরিক্ত সময় দিবে বা প্রয়োজনে ছেড়ে দিলে অধিকতর ছওয়াব অর্জন করা যাবে। আবু ক্বাতাদা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'যে ব্যক্তি ঋণ পরিশোধে অক্ষম ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে অথবা ঋণ ক্ষমা করে দিবে, আল্লাহ তাকে ক্বিয়ামতের দিন দুঃখ-কষ্ট হ'তে মুক্তি দিবেন' *(মুসলিম হা/৩০০৬; মিশকাত হা/২৯০৩)*। অন্য বর্ণনায় এসেছে, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন স্বীয় ছায়ায় ছায়া দান করবেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৯০৪)*।

প্রশ্ন (২৩/৪৬৩) : বারবার যেনা-ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা ব্যক্তির দো'আ কবুল হয় কী? আর যে ব্যক্তি অবৈধ সম্পর্কে যুক্ত তাকে বিবাহ করা উচিত হবে কি?

-রূহুল আমীন, ঢাকা।

উত্তর : প্রথমত কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে অথবা গোপনে হারাম কর্মে লিপ্ত থাকলে যেমন যেনা (ব্যভিচার), হারাম ভক্ষণ ইত্যাদি–তাহ'লে তার দো'আ কবুল হবে না। যদিও আল্লাহ তা'আলা কখনো কখনো গোনাহগারের দো'আও কবুল করেন। নবী করীম (ছাঃ) এমন এক ব্যক্তির কথা বর্ণনা করলেন, যে দীর্ঘ সফর করে, তার চুল এলোমেলো, দেহ ধূলিমলিন, সে আকাশের দিকে হাত তুলে বলে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার রব! অথচ তার খাবার হারাম, পানীয় হারাম, পোষাক হারাম এবং সে হারাম দ্বারা লালিত-পালিত তাহ'লে তার দো'আ কিভাবে কবুল হবে? *(মুসলিম হা/১০১৫; মিশকাত হা/২৭৬০)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'রাত্রির অর্ধভাগে আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেওয়া হয়। অতঃপর একজন আহ্বানকারী আহ্বান করতে থাকে যে, কেউ কি দো'আ করছে যাতে তা কবুল করা হয়? কেউ কি কিছু চাইছে যাতে

তা তাকে দেওয়া হয়? কেউ কি বিপদে আছে যাতে তা দূর করা হয়? তখন এমন কোন মুসলমান অবশিষ্ট থাকে না, যে দো'আ করে অথচ তা কবুল হয় না। কেবল সেই নারী ব্যতীত যে ব্যভিচারের জন্য পথে বের হয়' *(তাবারাণী আওসাত্ব হা/২৭৬৯, সনদ ছহীহ)*। দ্বিতীয়ত অবৈধ সম্পর্কে সম্পৃক্ত থাকা ব্যক্তিদ্বয় তওবা করলে তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক জুড়ে দেওয়া জায়েয। আর কোন অবৈধ সম্পর্কে যুক্ত ব্যক্তিকে বিবাহ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই প্রথমে তওবা করে গোনাহ মুক্ত হ'তে হবে।

প্রশ্ন (২৪/৪৬৪) : মসজিদের উন্নয়নের জন্য ইসলামী সম্মেলনের বক্তা ও মেহমানগণের আপ্যায়ন, সম্মানী এবং আনুষঙ্গিক খরচ মসজিদ ফান্ড থেকে করা যাবে কি?

-হাফছা, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : মসজিদ ফান্ড থেকে খরচ করা যাবে। তবে অপচয় এবং বাড়াবাড়ি থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। ফৎওয়া লাজনা দায়েমায় বলা হয়েছে- 'ইমামতি করার জন্য বেতন বা সম্মানী গ্রহণ করা যাবে, তা হোক ওয়াকফ তহবিল থেকে নির্ধারিত বেতন হিসাবে কিংবা সম্মানী হিসাবে। মুসলিম বিশ্বের আলেমগণ এর উপর আমল করে আসছেন। কারণ ইমামতি একটি জনকল্যাণমূলক দায়িত্ব। তাই যে ব্যক্তি ইমামতির দায়িত্ব পালন করবে, সে রাষ্ট্রীয় তহবিল, ওয়াকফ বা দান-অনুদান থেকেও এর পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবে' *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৭/৪২০)*। সুতরাং মসজিদ ফাণ্ড থেকে মসজিদের উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আলোচকদের ব্যয়ভার এবং অন্যান্য কার্যক্রমের খরচ বহন করা জায়েয। তবে সম্ভব হলে এ ধরনের আনুসঙ্গিক খরচগুলো অন্যান্য সামাজিক খাত থেকে গ্রহণ করাই অধিকতর উত্তম।

প্রশ্ন (২৫/৪৬৫) : পিতা সন্তান রেখে মারা গেলে সন্তানেরা দাদার সম্পত্তি পাবে না মর্মে সরাসরি কোন দলীল রয়েছে কি?

-আব্দুল্লাহ, নাটোর।

উত্তর : দাদার সম্পত্তিতে পৌত্র-পোত্রীদের কোন অংশ নেই। এজন্য যদি তাদের পিতা দাদার জীবদ্দশায় মারা যান, এমন ক্ষেত্রে তারা ওয়ারিছ হয় না। বরং উত্তরাধিকার পায় তাদের চাচারা, অর্থাৎ দাদার জীবিত ছেলেরা। কারণ আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসায় মাইয়েতের সম্পদ বণ্টনের যে খাতগুলো বর্ণনা করেছেন তাতে পৌত্র-পৌত্রীদের কথা উল্লেখ নেই। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'ফরয অংশগুলো তাদের প্রাপ্যদের মধ্যে বণ্টন করে দাও, তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা সবচেয়ে নিকটবর্তী পুরুষ আত্মীয়কে দেওয়া হবে *(বুখারী হা/৬৭৩২; মিশকাত হা/৩০৪২)*। অত্র হাদীছে নিকটতম বলতে মাইয়েতের ছেলেদের বুঝানো হয়েছে। তবে যদি দাদা নিজের জীবদ্দশায় সন্তানের অবর্তমানে তার পৌত্র-পৌত্রীদের জন্য কিছু অছিয়ত করে যান, যেমন সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের মধ্য থেকে কোন পরিমাণ, সেটা উত্তম হবে। দাদা চাইলে এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ, এক-পঞ্চমাংশ বা নির্দিষ্ট কিছু সম্পদ তাদের জন্য অছিয়ত করে যেতে পারেন। আর যদি দাদা অছিয়ত না করেও যান, তাহ'লে চাচা বা অন্য ওয়ারিছদের কর্তব্য হবে তাদেরকে সহযোগিতা করা। তবে কেউ যেন ভুল করে এটা মনে না করে যে, পৌত্রদের এই অংশ দেওয়া ফরয বা বাধ্যতামূলক। বরং এটা তাদের প্রতি সহানুভূতি *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/২০৪)*। উল্লেখ্য যে, সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা অনুযায়ী সম্পত্তি বণ্টন হওয়ায় পরিবারের প্রাথমিক দায়িত্ব বহনকারীই আগে সম্পদ পান। সেজন্য নাতী-নাতনীরা দাদার সম্পত্তির সরাসরি অংশীদার হন না। তবে সূরা বাক্বারা ১৮০ নং আয়াতের ভিত্তিতে একদল বিদ্বান মনে করেন, এরূপ অসহায় নাতী-নাতনীদের জন্য দাদার পক্ষ থেকে সম্পদ অছিয়ত করা ওয়াজিব *(ইবনু হাযম, আল-মুহাল্লা, ৮/৩৫১)*।

প্রশ্ন (২৬/৪৬৬) : আমার স্ত্রী ৭ মাসের গর্ভবতী। সম্প্রতি আল্ট্রাসনোগ্রাফির মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, আমাদের অনাগত শিশুটি এনেন্সেফালি নামক একটি মারাত্মক জন্মগত বিকলাঙ্গতায় আক্রান্ত। রিপোর্ট অনুযায়ী শিশুটির মাথার খুলির উপরের অংশ অনুপস্থিত। চিকিৎসকদের মতে, শিশুটি জন্মের কিছুদিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবে। এই রোগের কোন চিকিৎসা নেই। এমতাবস্থায় আমাদের জন্য গর্ভপাত করানো জায়েয হবে কি?

-আব্দুল মালেক, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এমতাবস্থায় গর্ভপাত ঘটানো যাবে না। বরং জন্মগ্রহণের পর স্বাভাবিক মৃত্যু পর্যন্ত চিকিৎসা চালিয়ে যেতে হবে। হ'তে পারে আল্লাহ তা'আলা এর মধ্যে শিশুর গঠনে পরিবর্তন করে দিবেন। সেজন্য অনাগত শিশুর সুস্থতার জন্য আল্লাহ্র নিকট দো'আ করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা যতদিন তার হায়াত রেখেছেন ততদিন পর্যন্ত সেবা করে যেতে হবে। রাবেতা আ'লামিল ইসলামীর ফিক্বহ বোর্ডে বলা হয়েছে- ১. যদি গর্ভধারণের সময় ১২০ দিনের কম হয় এবং নির্ভরযোগ্য, দক্ষ মুসলিম চিকিৎসকদের একটি মেডিকেল বোর্ডের মাধ্যমে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও পরীক্ষাগারে প্রাপ্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে এটি নিশ্চিত হওয়া যায় যে, শিশুটি গুরুতরভাবে বিকলাঙ্গ এবং তার চিকিৎসার কোন সম্ভাবনা নেই এবং গর্ভকাল পূর্ণ করে জন্মালে তার জীবন হবে অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং পরিবারকেও চরম কষ্টে ফেলবে তাহ'লে এই অবস্থায় পিতা-মাতার অনুরোধে গর্ভপাত করা জায়েয হবে। ২. যদি গর্ভধারণের সময়কাল একশত বিশ (১২০) দিন অতিক্রম করে ফেলে, তাহ'লে গর্ভপাত করা জায়েয নয়। যদিও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় জানা যায় যে শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মাবে। তবে যদি বিশ্বস্ত ও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের একটি মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, গর্ভ ধরে রাখলে মায়ের জীবন হুমকির মুখে পড়বে তাহ'লে এই পরিস্থিতিতে গর্ভপাত জায়েয হবে, শিশু বিকলাঙ্গ হোক বা না হোক, দুই বিপদের মধ্যে বড় বিপদকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে' *(উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ৬৪৫/১৩-১৪; রাবেতা আলমে ইসলামী-র ফিক্বহ একাডেমীর সিদ্ধান্ত (১২তম অধিবেশন, মক্কা মুকাররমা, ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ)*।

প্রশ্ন (২৭/৪৬৭) : পরিপূর্ণ ইসলাম পালন করে না- এমন ছেলে বা মেয়ে পক্ষকে বিবাহের জন্য ঐ ধরনের ছেলে বা মেয়ের খোঁজ দেওয়া বা ঘটকালি করা কি জায়েয হবে?

-হাফছাহ, কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ।

উত্তর : সঠিক তথ্য প্রদান করে বিবাহের ঘটকালি করা জায়েয। তবে কোন প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করা যাবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা সৎকর্ম ও আল্লাহভীতির কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না। আল্লাহকে ভয় কর *(মায়েদাহ ৫/২)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে আমাদের সাথে প্রতারণা করে, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়' *(মুসলিম হা/১০১)*।

প্রশ্ন (২৮/৪৬৮) : চাচাতো ভাই বা বোনের মেয়েকে বিবাহ করা জায়েয কি?

-আশরাফুল আলম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : জায়েয। কারণ তারা মাহরাম নয়। যদি না অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে; যেমন দুধ ভাই-বোনের সম্পর্ক ইত্যাদি *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৩৩/৭৩)*। আল্লাহ তা'আলা মাহরাম নারীদের আলোচনা শেষে বলেন, 'উপরোক্ত নারীদের ছাড়া অন্য সকল নারী তোমাদের জন্য হালাল, যদি তোমরা তাদেরকে মোহর দিয়ে বিবাহ করার ইচ্ছা কর, ব্যভিচারী না হয়ে' *(নিসা ৪/২৪)*।

প্রশ্ন (২৯/৪৬৯) : আলুর যাকাত আছে কি? শস্যের বদলে আলু বা সবজি চাষ করে কেউ লাখ লাখ টাকা উপার্জন করছে। কিন্তু তার ওশর দিতে হচ্ছে না। কোন দান-ছাদাক্বাও করছে না। এটা সঠিক হচ্ছে কি?

-আসাদুল ইসলাম, কাকনহাট, রাজশাহী।

উত্তর : আলু সবজির অন্তর্ভুক্ত। আর শরী'আতে সবজির উপর ওশর নির্ধারণ করা হয়নি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'সবজির কোন যাকাত নেই' *(তাবারাণী আওসাত্ব হা/৫৯২১; ছহীহুল জামে' হা/৫৪১১)*। তবে সবজি ও তরি-তরকারী বিক্রয় লব্ধ অর্থ এক বছর সঞ্চিত থাকলে এবং নেছাব পরিমাণ হ'লে শতকরা আড়াই টাকা হারে নিয়মমাফিক যাকাত দিতে হবে *(মুসলিম হা/৯৭৯)*।

প্রশ্ন (৩০/৪৭০) : মসজিদ দূরে হওয়ায় প্রতি ওয়াক্ত ছালাত বাসায় জামা'আতে আদায় করা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম, উল্লাপাড়া, কুড়িগ্রাম।

উত্তর : জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা পুরুষের জন্য ওয়াজিব। বিশেষ করে যদি সে মসজিদের আযান শুনতে পায় এবং সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আযান শুনে ছালাতে আসে না, তার ছালাত নেই। যদি না বৈধ ওযর থাকে' *(ইবনু মাজাহ হা/৭৯৩; মিশকাত হা/১০৭৭, সনদ ছহীহ)*। তবে নিম্নের কারণগুলো বিদ্যমান থাকলে বাড়িতে মাঝে মধ্যে ছালাত আদায় করা যেতে পারে। যেমন- ১. মসজিদ অধিক দূরে হওয়া, যেখানে যাওয়া কষ্টকর বা অনেক সময়সাপেক্ষ, ২. বৃষ্টি বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ৩. অসুস্থতা বা দুর্বলতা, ৪. আমানতের দায়িত্বে থাকা (যেমন নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা), ৫. ভয় বা নিরাপত্তার হুমকি থাকা। সুতরাং যদি মসজিদ এতটাই দূরে হয় যে নিয়মিত যাওয়া কষ্টকর বা অতিরিক্ত সময় লাগে, তবে তা শারঈ ওযর হিসাবে বিবেচিত হবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/৩৬)*।

প্রশ্ন (৩১/৪৭১) : জনৈক ভদ্রলোকের দু'জন স্ত্রী। তার জীবদ্দশায় প্রথমা স্ত্রী, এক ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা যায়। ঐ ব্যক্তি প্রথমা স্ত্রীর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া (জমি) সম্পদ থেকে কিছু সম্পদ মীরাছ হিসাবে পেয়েছেন। এক্ষণে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুকালে প্রথমা স্ত্রীর এক ছেলে, এক মেয়ে সহ দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, পাঁচ ছেলে ও এক মেয়ে রেখে মারা যান। প্রশ্ন হচ্ছে প্রথমা স্ত্রী থেকে প্রাপ্ত সম্পদ কি শুধুমাত্র প্রথমা স্ত্রীর সন্তানেরা পাবে নাকি দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, সন্তানরাও পাবে?

-তাওহীদুল ইসলাম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : মাইয়েতের রেখে যাওয়া সম্পদ তার ওয়ারিছদের সকলেই পাবে। মাইয়েত কোন উৎস থেকে সম্পদ লাভ করেছিলেন সেটা ধর্তব্য নয়। কোন ব্যক্তি যখন মৃত স্ত্রীর মীরাছ হিসাবে কোন সম্পত্তি প্রাপ্ত হন তখন তা পুরোপুরি তার মালিকানায় চলে আসে। সেজন্য মাইয়েত যে সম্পদ রেখে মারা গেছেন তা প্রথমা স্ত্রীর সন্তানরা এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীসহ তার সন্তানরা সকলেই শরী'আত কর্তৃক নিধারিত অংশ পাবেন। এক্ষেত্রে কোন তারতম্য করা যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা যায়, তা তার ওয়ারিছদের জন্য' *(বুখারী হা/২২৯৮, ২৩৯৮; মিশকাত হা/৩০৪১)*।

প্রশ্ন (৩২/৪৭২) : স্ত্রীকে কেবলমাত্র ভয় দেখানোর নিয়তে মেসেজে ৩ তালাক লিখলে তা তালাক হিসাবে গণ্য হবে কি? তালাক হয়ে গেলে পুনরায় একত্রিত হওয়ার উপায় কি?

-ইশরাত, চট্টগ্রাম।

উত্তর : তালাকের নিয়ত না করে শুধুমাত্র মেসেজ লিখে থাকলে তালাক হবে না। তাছাড়া তালাক শব্দ মুখে উচ্চারণ বা খাতায় উল্লেখ করলেই তালাক হয় না। বরং তালাক দিলাম বা এজাতীয় বাক্য ব্যবহার করতে হয়। ইবনু কুদামাহ বলেন, যদি কেউ তালাকের নিয়ত ছাড়া লিখে, তাহ'লে জমহূর বিদ্বানের মতে তালাক কার্যকর হবে না। কারণ লেখার বহু উদ্দেশ্য থাকতে পারে। এগুলোর কোনটির সঙ্গেই তালাক দেওয়ার নিয়ত নাও থাকতে পারে *(আল-মুগনী ৭/৪৮৬)*। শায়েখ বিন বায (রহঃ) বলেন, এই তালাক উক্ত মহিলার ওপর কার্যকর হবে না, যদি তালাকদাতা এর দ্বারা তালাকের নিয়ত না করে থাকে। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আমলসমূহ নিয়তের উপর নির্ভরশীল' *(ফাতাওয়া ইসলামিয়া ৩/২৭৮)*। অতএব 'তালাক' বা অনুরূপ শব্দ লেখা তালাকে কেনায়ার মধ্যে গণ্য। তাতে নিয়ত থাকলে তালাক হয়ে যাবে। আর নিয়ত না থাকলে তালাক হবে না।

প্রশ্ন (৩৩/৪৭৩) : আমার স্বামী তার বাবা-মা থেকে আলাদা

হয়ে আমার ও দুই সন্তানের সাথে ভাড়া বাসায় থাকেন। মাঝে মাঝে শ্বশুর-শাশুড়ি একসাথে থাকার জন্য কান্নাকাটি করেন। আমার স্বামীও তাদের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়ে একসাথে থাকার কথা বলেন, যদিও আমার এতে মানসিক অশান্তি হয়। আমি যদি তাদের সাথে না থাকতে চাই, এতে আমার গোনাহ হবে কি?

-সুমাইয়া, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : গোনাহ হবে। কারণ এতে স্বামীর পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে, যাতে স্বামীও কষ্ট পাচ্ছেন। সেজন্য সম্ভবপর স্বামীর ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিতে হবে। রাসূল (ছাঃ) জনৈক নারীকে বলেন, তুমি দেখো, তুমি তার (স্বামীর) অন্তরের কোথায় অবস্থান করছ। কেননা সে-ই তোমার জান্নাত এবং সে-ই তোমার জাহান্নাম' *(আহমাদ হা/২৭৩৯২; ছহীহাহ হা/২৬১২)*।

প্রশ্ন (৩৪/৪৭৪) : আত্মরক্ষার কোন উপায় না থাকলেও যদি কেউ জীবন, সম্মান বা সম্পদ রক্ষার জন্য দলবদ্ধ অস্ত্রধারী ছিনতাইকারী বা ডাকাতদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে আহত বা নিহত হয়, তাহ'লে সে শহীদ হিসাবে গণ্য হবে কি? আর যদি প্রতিরোধে নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কা জেনেও কেউ তা করে, তবে কি তা আত্মহত্যা হিসাবে ধরা হবে, না-কি শরী'আতে বৈধ সাহসী পদক্ষেপ হিসাবে গণ্য হবে?

-আব্দুর রহমান ইব্রাহীম, নাটোর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি নিজের জীবন রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ। যে ব্যক্তি দ্বীন রক্ষায় নিহত হয়, সে শহীদ। আর যে ব্যক্তি পরিবার রক্ষায় নিহত হয়, সেও শহীদ' *(মুসলিম হা/৪৭৭২; মিশকাত হা/৩৫১২)*। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কী বলেন, যদি কেউ এসে আমার সম্পদ নেওয়ার চেষ্টা করে? তখন কি করতে হবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার সম্পদ তাকে দিবে না। সে বলল, যদি সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে? তিনি বললেন, তুমি তার সঙ্গে যুদ্ধ কর। সে বলল, যদি সে আমাকে হত্যা করে? তিনি বললেন, তুমি শহীদ। সে বলল, যদি আমি তাকে হত্যা করি? তিনি বললেন, সে জাহান্নামী' *(মুসলিম হা/১৪০; মিশকাত হা/৩৫১৩)*। যদি কেউ নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ করে, তবে তা আত্মহত্যা নয় বরং ইসলামে বৈধ সাহসিকতা। কারণ আত্মহত্যা হ'ল নিরর্থক নিজের প্রাণনাশ করা। কিন্তু ন্যায় রক্ষায় আত্মোৎসর্গ আত্মহত্যা নয় বরং ইবাদত ও সাহসিকতা। আছেম ইবনু ছাবেত বলেন, 'তার এই লড়াই হবে নিজের অথবা নিজের সম্মান রক্ষার জন্য। এমনকি যদি তার ধারণা থাকে যে এতে সে শহীদ হবে তবুও। যদি এই প্রতিরোধের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য (অন্যায় প্রতিরোধ বা নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ) অর্জিত হয়, তাহ'লে তা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ জিহাদের একটি চেষ্টার অংশ বলে গণ্য হবে *(জামে'উল মাসায়েল ৫/৩২৮-৩২৯)*। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, তাদের (অর্থাৎ ছিনতাইকারী দলকে) সহজতম উপায়ে প্রতিরোধ করতে হবে। যদি তাদেরকে লড়াই করে সরানোর প্রয়োজন হয়, তাহ'লে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বৈধ। যদি কেউ এই লড়াইয়ের সময় নিহত হয়, তবে সে শহীদ হবে *(মাজমূউল ফাতাওয়া ৩৪/২৪২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৪৭৫) : 'জিহাদ' বলতে কি শুধুমাত্র সশস্ত্র যুদ্ধ বুঝায় নাকি এর ব্যাপক অর্থ রয়েছে? হাদীছে জিহাদ ও শাহাদতের যে মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে সেগুলো কেবল সশস্ত্র জিহাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি?

-হুমায়ন কবীর, বগুড়া।

উত্তর : জিহাদ অর্থ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। পারিভাষিক অর্থে আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। এর দ্বারা নিজেকে এবং অপরকে প্রবৃত্তির চাহিদা থেকে দূরে রাখা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকে বুঝানো হয়। ইবনু হাজার বলেন, নফস, শয়তান ও ফাসিকদের বিরুদ্ধে জিহাদও এর অন্তর্ভুক্ত *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৬/৫ পৃ.)*। কাফিরের বিরুদ্ধে জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। চাই সেটা হাত দিয়ে হৌক, যবান দিয়ে হৌক বা মাল দিয়ে হৌক কিংবা অন্তর দিয়ে হৌক *(ফাৎহুল বারী হা/২৮২৫-এর ব্যাখ্যা, ৬/৪৫ পৃ.)*। জিহাদ ও শাহাদতের মর্যাদা মূলত সশস্ত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণ কারীদের ব্যাপারেই বলা হয়েছে। এজন্য শহীদকে দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। ১. শহীদে হাক্বীক্বী বা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে শাহাদাত বরণ কারী বা নিজের সম্মান, সম্পদ ও জীবন রক্ষা করতে গিয়ে শাহাদাত বরণ কারী । ২. শহীদে হুকমী বা বিধানগতভাবে শহীদ। যেমন বিভিন্ন হাদীছে সাত শ্রেণীর শহীদের বর্ণনা এসেছে *(আবুদাউদ হা/৩১১১; মিশকাত হা/১৫৬১)*।

প্রশ্ন (৩৬/৪৭৬) : ফেরেশতা, জান্নাত-জাহান্নাম, মীযান ইত্যাদি অদৃশ্য বিষয়ের উপর বিশ্বাস কতটুকু যরূরী? বিশ্বাস না রাখলে মুসলিম থাকা যাবে কি?

-ইমাম হোসাইন, রূপগঞ্জ, ঢাকা।

উত্তর : গায়েব বা অদৃশ্যের প্রতি বিশ্বাস করা ফরয। মুত্তাক্বীদের জন্য ছয়টি বিশ্বাস রাখা আবশ্যক। যেমন আল্লাহ বলেন, 'যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে ও ছালাত কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে' (৩)। 'যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ঐসব বিষয়ে, যা তোমার প্রতি নাযিল হয়েছে এবং যা তোমার পূর্ববর্তীগণের প্রতি নাযিল হয়েছিল। আর যারা আখেরাতে নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করে' *(বাক্বারাহ ২/৩-৪)*। মূলত কুরআন-সুন্নাহ্র বিধান সমূহ অহিয়ে এলাহীর উপর নির্ভরশীল। আর অহি অদৃশ্য বস্তু, যার উপর বিশ্বাস ব্যতীত কেউ মুসলমান হ'তে পারে না। অতএব গায়েবের উপর বিশ্বাসই ইসলামের মূল।

প্রশ্ন (৩৭/৪৭৭) : অন্য ধর্মের অনুসারীরাও যদি সৎ হয়, তাহ'লে জান্নাতে যাবে- এ ধারণা শরী'আতে গ্রহণযোগ্য কি?

-শরীফুল ইসলাম, কুষ্টিয়া।

উত্তর : সব ধর্ম আল্লাহ্র অনুমোদিত নয়। অতএব অন্য ধর্মের অনুসারীরা সৎ হলেও পরকালে তা কোন কাজে লাগবে না *(ফুরক্বান ২৩; নূর ৩৯)*। আল্লাহ বলেন, 'আল্লাহ্র মনোনীত

একমাত্র ধর্ম হ'ল ইসলাম *(আলে ইমরান ৩/১৯)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি 'ইসলাম' ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম তালাশ করবে, তার নিকট থেকে তা কখনোই কবুল করা হবে না' *(আলে ইমরান ৩/৮৫)*। বিদায় হজ্জের ভাষণের এক পর্যায়ে আল্লাহ তা'আলা নাযিল করেন, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহকে সম্পূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসাবে মনোনীত করলাম' *(মায়েদাহ ৫/৩)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, সেই আল্লাহ্র কসম! এই উম্মতের মধ্যে ইহূদী বা খ্রিস্টান যে কেউ হোক না কেন, যে আমার আগমন বার্তা শুনেছে, অথচ আমি যা নিয়ে আগমন করেছি, তার উপরে ঈমান আনেনি, সে অবশ্যই জাহান্নামী হবে' *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, ইবনু জুদ'আন জাহিলিয়্যাতের যুগে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করত এবং মিসকীনদেরকে আহার দিত। তাহলে কি এসব তার জন্য উপকারী হবে? তিনি বললেন: 'না, তা তার কোনো উপকারে আসবে না। কারণ সে কখনোই এ কথা বলেনি হে আমার প্রতিপালক! কিয়ামতের দিনে আমার গুনাহ মাফ করে দিও' *(মুসলিম হা/২১৪)*। অতএব ইসলাম আগমনের পরে অন্য কোন ধর্মের অনুসারীদের জান্নাতী হওয়ার সুযোগ নেই। তারা সৎ হলে দুনিয়াতেই কেবল প্রশংসা পাবে, তবে আখেরাতে তাদের কোন অংশ নেই *(শূরা ২০)*।

প্রশ্ন (৩৮/৪৭৮) : সিদরাতুল মুনতাহা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুহাম্মদ গিয়াছুদ্দীন, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।

উত্তর : সিদরাতুল মুনতাহা আল্লাহ্র আরশের নিকটে, সপ্তম আকাশের এক প্রান্তে অবস্থিত। এই গাছের নাম ও অবস্থান ইসলামী আক্বীদার গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বিশেষ করে মি'রাজ সম্পর্কিত বর্ণনায়। সিদরাতুল মুনতাহাতেই শেষ হয় যা কিছু পৃথিবী থেকে উর্ধ্বে উঠে, আর সেখান থেকেই তা গ্রহণ করা হয়। সেখানেই শেষ হয় যা কিছু উপর থেকে অবতীর্ণ হয় এবং সেখান থেকেই তা ধরা হয়। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, এটি একটি বিশাল বৃক্ষ, যা সকল ফেরেশতা, নবী ও সৃষ্টি জগতের জন্য সর্বোচ্চ সীমান্ত। এর ওপারে কেবল আল্লাহ্র আদেশে কেউ যেতে পারে। সেখানেই নবী করীম (ছাঃ) মি'রাজ শেষে পৌঁছেন *(ফাৎহুলবারী ৭/২১২-১৩)*। ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'সিদরাতুল মুনতাহাকে এই নামে ডাকা হয়, কারণ ফেরেশতাগণের জ্ঞান সেখানে গিয়েই শেষ হয়ে যায়। আর কেউই তা অতিক্রম করেননি, শুধু রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যতীত *(শরহ মুসলিম ২/২১৪)*। আল্লাহ তা'আলা এ সম্পর্কে বলেন, নিশ্চয়ই সে তাকে আরেকবার দেখেছিল। সিদরাতুল মুনতাহার নিকটে। তার নিকটে আছে জান্নাতুল মাওয়া। যখন বৃক্ষটিকে আচ্ছাদিত করে রেখেছিল যা তাকে আচ্ছাদিত করে *(নাজম ৫৩/১৩-১৬)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে মি'রাজে নিয়ে যাওয়া হ'ল, তখন তাঁকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এটি ষষ্ঠ/সপ্তম আসমানে অবস্থিত। এটাই সেই স্থান, যেখানে পৃথিবী থেকে যা কিছু উপরে ওঠে, তা এসে শেষ হয় ও সেখান থেকেই গ্রহণ করা হয় এবং যা কিছু ওপর থেকে নেমে আসে, তা এখানেই এসে শেষ হয় এবং এখান থেকেই তা গ্রহণ করা হয়। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ বলেন, সিদরাতুল মুনতাহাকে যা আচ্ছন্ন করেছিল। সেটা ছিল সোনার পোকা বা প্রজাপতি *(মুসলিম হা/২৭৯; মিশকাত হা/৫৮৬৫)*। তিনি আরো বলেন, 'এরপর আমার সামনে উন্মুক্ত করা হ'ল সিদরাতুল মুনতাহা। তখন আমি দেখলাম, এর ফল ছিল হাজার শহরের বড় বড় পানির পাত্রের মতো, আর এর পাতাগুলো ছিল হাতির কানের মত। বলা হ'ল এই হচ্ছে সিদরাতুল মুনতাহা *(বুখারী হা/৩৮৮৭)*।

প্রশ্ন (৩৯/৪৭৯) : জিনদের নিকট যাওয়ার পথে রাসূল (ছাঃ) কাকে সাথে নেন? তিনি ছাহাবীকে রেখে যাওয়ার সময় চারটি দাগ টেনে তার মধ্যে থাকতে বলেন। এসময় তিনি কোন দো'আ পাঠ করেছিলেন?

-মুছলেহুদ্দীন, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : এই সফরে সাথে ছিলেন প্রখ্যাত ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ)। যেমন তিনি বলেন, এক রাতে নবী করীম (ছাঃ) আমাকে নিয়ে হেরা পাহাড়ের দিকে গেলেন। একটি স্থানে পৌঁছে আমার জন্য একটি দাগ টেনে দিলেন এবং বললেন, এ দাগের বাইরে যেয়ো না, আমি তোমার কাছে ফিরে আসব। তারপর তিনি (জিনদের দিকে) চলে গেলেন *(মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৪১৪৫)*। তবে এসময়ে তিনি কোন দো'আ পড়েছিলেন তা হাদীছে বর্ণিত হয়নি। কেউ কেউ সূরা নাস ও ফালাক্বের কথা বলে থাকেন, তবে এর পক্ষে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন (৪০/৪৮০) : আল্লাহ নেক আমলের ছওয়াব বিশ লক্ষগুণ পর্যন্ত বাড়িয়ে দেন। মুসনাদে আহমাদ-এর এই বর্ণনাটি ছহীহ কি?

-গোলাম রাব্বী, বরিশাল।

উত্তর : উক্ত মর্মে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে যেটি পাওয়া যায় তা হ'ল- রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা সৎকর্ম ও অসৎকর্মগুলো লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং কেউ যদি কোন সৎকর্ম করার সংকল্প করে, কিন্তু তা করতে না পারে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। আর যদি সে তা করে, তবে আল্লাহ তার জন্য দশগুণ থেকে শুরু করে সাতশত গুণ, এমনকি আরো অনেক গুণ পর্যন্ত লিখে দেন। আর কেউ যদি কোন গোনাহ করার সংকল্প করে, কিন্তু তা না করে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখে দেন। আর যদি সে তা করে ফেলে, তাহ'লে আল্লাহ তার জন্য শুধু একটি গোনাহই লিখেন *(বুখারী হা/৬৪৯১; মিশকাত হা/২৩৭৪)*।

YEAR TABLE (28th Vol.) বর্ষসূচী-২৮ (Oct. 2024 to Sept. 2025)

(২৮তম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০২৪ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত)

*** সম্পাদকীয় :** **১.** সংবিধান প্রণয়ন প্রসঙ্গে *(অক্টোবর'২৪)* **২.** প্রসঙ্গ : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার *(নভেম্বর'২৪)* **৩.** অহি-র আলোয় উদ্ভাসিত হৌক তারুণ্য *(ডিসেম্বর'২৪)* **৪.** মযলূমের বিজয় ও যালেমের পরাজয় অবধারিত *(জানুয়ারী'২৫)* **৫.** আল্লাহ ছাড় দেন কিন্তু ছাড়েন না! *(ফেব্রুয়ারী'২৫)* **৬.** কুরআনী রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপরেখা *(মার্চ'২৫)* **৭.** কুরআনী বিচারব্যবস্থার স্বরূপ *(এপ্রিল'২৫)* **৮.** ভারতের নতুন ওয়াক্ফ আইন বাতিল করুন! *(মে'২৫)* **৯.** ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ : কাশ্মীর সংকটের স্থায়ী সমাধানই উত্তরণের একমাত্র পথ *(জুন'২৫)* **১০.** ইসলাম-ই বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল চেতনা *(জুলাই'২৫)* **১১.** অস্থির সময়ে চাই আদর্শিক দৃঢ়তা *(আগস্ট'২৫)* **১২.** বাংলাদেশে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের সময় এখনই *(সেপ্টেম্বর'২৫)*।

*** দরসে কুরআন :** বাহ্যিকভাবে পরস্পর বিরোধী আয়াত সমূহের সমন্বয় *(মার্চ'২৫) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** দরসে হাদীছ :** প্রত্যেকের আমল ও ফিৎরাত অনুযায়ী বিচার হবে *(সেপ্টেম্বর'২৫) -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব*।

*** প্রবন্ধ :**

(১) অক্টোবর'২৪ : ১. পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার ক্ষতিকর প্রভাব *(২৮/১-২) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** ওশর : দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার *-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম* **৩.** আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাসে শিথিলতা : আমাদের করণীয় *(২৮/১-৫) -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **৪.** ঘোড়ার গোশত : হালাল নাকি হারাম? একটি পর্যালোচনা *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* **৫.** কুরআন নিয়ে চিন্তা করব কিভাবে? *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(২) নভেম্বর'২৪ : : ১. রিয়া : পরিচয় ও প্রকারভেদ *-ড. নূরুল ইসলাম*, **২.** জান্নাতে প্রাসাদ নির্মাণ করবেন যেভাবে *(২৮/২-৩) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(৩) ডিসেম্বর'২৪ : ১. পাপাচার থেকে পরিত্রাণের উপায় সমূহ *(২৮/৩-৫) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** অনারবী ভাষায় জুম'আ ও ঈদায়েনের খুৎবা : একটি বিশ্লেষণ *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম*।

(৪) জানুয়ারী'২৫ : ১. তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার স্বরূপ *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **২.** টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানের শাস্তি *-আব্দুল মালেক বিন ইদরীস*।

(৫) ফেব্রুয়ারী'২৫ : ১. কুরআন ও সুন্নাহ্র আলোকে শাম ও তার অধিবাসীদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য *-মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* **২.** তাক্বদীরের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট থাকার ফলাফল *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৩.** ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(৬) মার্চ'২৫ : ১. কুরআনের সঠিক মর্ম অনুধাবনে শানে নুযূলের গুরুত্ব *-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **২.** কুরআন সংকলনের ইতিহাস *-ড. মুহাম্মাদ আজীবর রহমান* **৩.** বিজ্ঞানীদের উপর কুরআনের প্রভাব *-প্রফেসর ড. শহীদ নকীব ভূঁইয়া* **৪.** সমাজে অপরাধপ্রবণতা হ্রাসে কুরআনে বর্ণিত শাস্তিবিধানের অপরিহার্যতা *(২৮/৬-৯) -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **৫.** কেবল কুরআন অনুসরণই কি যথেষ্ট? *-মুহাম্মাদ খায়রুল ইসলাম* **৬.** কুরআনের আলোকে রামাযান *-ড. মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম*।

(৭) এপ্রিল'২৫ : ১. কুরআন মাজীদকে আঁকড়ে ধরার স্বরূপ *(২৮/৭-৮) -ড. নূরুল ইসলাম* **২.** আল-কুরআনে আক্বীদার পাঠ *-ড. আব্দুল্লাহিল কাফী মাদানী* **৩.** আল-কুরআনে নাসেখ ও মানসূখ *(২৮/৭-৮) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* **৪.** সালাফদের কুরআন চর্চা *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(৮) মে'২৫ : ১. যে আমলে সম্মান বাড়ে *(২৮/৮-৯) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(৯) জুন'২৫ : ১. নারী সংস্কার কমিশনের অন্যায় সুপারিশ সমূহ*-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব* **২.** কুরবানী কবুলযোগ্য করার উপায় *-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **৩.** রিয়া-র আলামত *-ড. নূরুল ইসলাম* **৪.** মাসায়েলে কুরবানী *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

(১০) জুলাই'২৫ : ১. ধর্মীয় জ্ঞান কতটুকু জানা ফরয? *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **২.** কুরআনের বিরুদ্ধে প্রাচ্যবিদদের সংশয়সমূহ ও তার জবাব *(২৮/১০-১১) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **৩.** ইসলামের দৃষ্টিতে সহশিক্ষার ভয়াবহতা *-ড. ইহসান ইলাহী যহীর* **৪.** তাক্বওয়ার ফযীলত ও গুরুত্ব *(২৮/১০-১১) -মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ* **৫.** সন্তানদের প্রতি সালাফদের উপদেশ *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(১১) আগস্ট'২৫ : ১. রিয়া : কারণ ও প্রতিকার *-ড. নূরুল ইসলাম* **২.** ইলম ও আমলের সমন্বয় *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

(১২) সেপ্টেম্বর'২৫ : ১. বিবাহ সম্পর্কিত কতিপয় রীতি-নীতি *-মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **২.** ভুল স্বীকার : সাহস ও সততার অনন্য নিদর্শন *-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব* **৩.** ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব *-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **৪.** ঈদে মীলাদুন্নবী *-আত-তাহরীক ডেস্ক*।

প্রচ্ছদ রচনা : ১. এই নৃশংসতার শেষ কোথায়? *(আগস্ট'২৫) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন*। **২.** শরণার্থীদের জীবন : অবরুদ্ধ মানুষের করুণ আর্তনাদ *(সেপ্টেম্বর'২৫) -আত-তাহরীক ডেস্ক*।

সাময়িক প্রসঙ্গ : ১. সীমান্তে হত্যা : বন্ধ হবে কবে? *(অক্টোবর'২৪) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* **২.** যুদ্ধ বিধ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্য কোন পথে! *(নভেম্বর'২৪) -আত-তাহরীক ডেস্ক* **৩.** গণতন্ত্র নয়, চাই ইসলামী খেলাফত *(ডিসেম্বর'২৪) -ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন* **৪.** ভারতীয় আগ্রাসন বন্ধ হৌক : প্রভুত্ব নয়! চাই ন্যায্য হিস্যার ভিত্তিতে বন্ধুত্ব *(জানুয়ারী'২৫) -ঐ* **৫.** রাসূল (ছাঃ)-এর শানে শব্দ প্রয়োগে সতর্কতা *(ফেব্রুয়ারী'২৫) -মুহাম্মাদ জুয়েল রানা* **৬.** সংবিধানে বহুত্ববাদ : নতুন মোড়কে পুরনো মদ *(মে'২৫) -ঐ*।

সময়ের ভাবনা : ১. গণতন্ত্রের বিকল্প কি? *(ডিসেম্বর'২৪) -ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব* **২.** ছালাহুদ্দীন ও আল-কুদস : ইতিহাসের পাদপীঠে ভবিষ্যৎ ভাবনা *(জুন'২৫) -সারওয়ার মিছবাহ*।

দিশারী : ১. জামা'আত ও বায়'আত সম্পর্কিত সংশয়সমূহ পর্যালোচনা *(২৮/১, ৩) -গবেষণা বিভাগ, হা.ফা.বা.* **২.** মোযার উপর মাসাহ : একটি পর্যালোচনা *(জানুয়ারী'২৫) -মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম* **৩.** আল-কুরআনে আয়াত সংখ্যা : একটি পর্যালোচনা *(আগস্ট'২৫) -ঐ*।

ছাহাবী চরিত : **১.** হোসাইন বিন আলী (রাঃ) *(২৮/২, ১০-১১) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*। **২.** হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ) *(মে'২৫) -ড. মুখতার আযহার*।

মনীষী চরিত : আব্দুর রহমান ইবনু নাছির আস-সা'দী *(এপ্রিল'২৫) -ড. গোলাম কিবরিয়া*।

শিক্ষাঙ্গন : **১.** আরবী ভাষা চর্চায় প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প *(অক্টোবর'২৪) -সারওয়ার মিছবাহ* **২.** শিক্ষক নয়; শিক্ষা-উদ্যোক্তা হৌন! *(নভেম্বর'২৪) -ঐ* **৩.** সংস্কারমুখী শিক্ষাধারায় বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা *(ডিসেম্বর'২৪) -ঐ* **৪.** টাইম পাস *(জানুয়ারী'২৫) -ঐ* **৫.** শিক্ষক ও কিতাবের আদব রক্ষা করুন! *(ফেব্রুয়ারী'২৫) -ঐ* **৬.** শিক্ষার্থীদের সাথে কুরআনের সম্পর্ক *(মার্চ'২৫) -ঐ* **৭.** প্রচলিত হিফয বিভাগ : কতিপয় প্রস্তাবনা *(এপ্রিল'২৫) -ঐ* **৮.** মাদ্রাসা কারিকুলামে কারিগরী শিক্ষা *(মে'২৫) -ঐ* **৯.** ইলমুন নাহু : পাঠ্যপুস্তক ও পাঠদান *(জুন'২৫) -ঐ* **১০.** আধুনিক যুগে শিক্ষকতা *(জুলাই'২৫) -ঐ* **১১.** কারিকুলামে প্রতিভার মূল্যায়ন *(আগস্ট'২৫) -ঐ* **১২.** আরবী ভাষা চর্চা ও পাঠদান *(সেপ্টেম্বর'২৫) -ঐ*।

সাহিত্যাঙ্গন : **১.** জীবন হ'ল মৃত্যুর পথে নিরন্তর ছুটে চলা *(নভেম্বর'২৪) -মুহাম্মাদ মুবাশশিরুল ইসলাম* **২.** ঋতুবৈচিত্র্যে অবগুণ্ঠিত বিচিত্র জীবনবোধ *(ডিসেম্বর'২৪) -ঐ* **৩.** বর্ষশেষে শব্দে আঁকা দু'টি দিনলিপি *(জানুয়ারী'২৫) -ঐ* **৪.** মধ্য ফেব্রুয়ারীর সংস্কৃতি *(ফেব্রুয়ারী'২৫) -ঐ*।

সন্তান পরিচর্যা : **১.** বই হোক সন্তানের নিত্য সঙ্গী *(জুন '২৫)-জাহিদ হাসান* **২.** শিশুর আবেগকে অবহেলা নয় *(জুলাই'২৫)-ঐ* **৩.** শিশুদের জন্য স্ক্রিন টাইম ও কন্টেন্ট নির্বাচন *(আগস্ট'২৫)-ঐ* **৪.** পুত্র সন্তানদের উপদেশ ও শাসনের সঠিক কৌশল : একটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ *(সেপ্টেম্বর'২৫) -ঐ*।

ইতিহাস-ঐতিহ্য : **১.** নিযামিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার অজানা কাহিনী *(নভেম্বর'২৪) -মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ* **২.** মুসলমানদের সাইপ্রাস বিজয় *(নভেম্বর'২৪)-ঐ* **৩.** আরাকানে ইসলাম *(ফেব্রুয়ারী'২৫)-ঐ* **৪.** ঈদ নিছক সংস্কৃতি নয় *(মে'২৫)-ঐ* **৫.** দফ ইসলামী ঐতিহ্যের অংশ *(জুলাই'২৫)* **৬.** আল-হামরা : হারিয়ে যাওয়া স্বর্ণযুগের নীরব সাক্ষী *(আগস্ট'২৫)-ঐ*।

মহিলা অঙ্গন : **১.** ঋতুবতী অবস্থায় মহিলাদের জন্য যেসব কাজ নিষিদ্ধ *(অক্টোবর'২৪) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম* **২.** সন্তান প্রতিপালনের রূপরেখা *(নভেম্বর'২৪) -মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক* **৩.** সন্তান প্রতিপালনে কতিপয় বর্জনীয় *(ডিসেম্বর'২৪) -ঐ* **৪.** সন্তান প্রতিপালনে ঘরোয়া সিলেবাস *(জানুয়ারী'২৫) -গবেষণা বিভাগ, হা.ফা.বা.* **৫.** মহিলাদের দাওয়াতী কাজের পদ্ধতি *(ফেব্রুয়ারী'২৫) -সারওয়ার মিছবাহ* **৬.** ইসলামে নারীর কর্মসংস্থান : একটি পর্যালোচনা *(সেপ্টেম্বর'২৫) -ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম*।

নবীনদের পাতা : মানসিক প্রশান্তি লাভে আল-কুরআন *(মার্চ'২৫) -মুজাহিদুল ইসলাম*।

ভ্রমণ স্মৃতি : কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও দাওয়াতী সফর ২০২৪ *(ফেব্রুয়ারী'২৫) -আত-তাহরীক ডেস্ক*।

অমর বাণী : *(২৮/২, ৫, ৭) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

করণীয়-বর্জনীয় : **১.** অধিক ইবাদতের সুবর্ণ সুযোগ শীতকাল *(জানুয়ারী'২৫) -ড. ইহসান ইলাহী যহীর*।

হাদীছের গল্প : **১.** কাউকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা যাবে না *(অক্টোবর'২৪) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ* **২.** রাসূল (ছাঃ)-এর দাওয়াতী কৌশল *(নভেম্বর'২৪) -আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ* **৩.** হযরত ওছমান (রাঃ) যেভাবে খলীফা মনোনীত হয়েছিলেন *(ফেব্রুয়ারী'২৫) -ঐ* **৪.** নবী করীম (ছাঃ)-এর হজ্জের বিবরণ *(মে'২৫) -ঐ*।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান : **১.** মুচি থেকে শিক্ষক *(জানুয়ারী'২৫) -মুহসিন জব্বার, অনুবাদ : নাজমুন নাঈম* **২.** নেককার স্ত্রী (জুন'২৫)*-ঐ* **৩.** উত্তম প্রতিশোধ *(জুলাই'২৫) -ঐ* **৪.** সন্তানকে মুছল্লী বানাবেন কিভাবে? *(আগস্ট'২৫)-ঐ* **৫.** নীল জুতার দো'আ *(সেপ্টেম্বর'২৫) -আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ*।

চিকিৎসা জগৎ : **১.** ব্লাডপ্রেসার সম্পর্কে যরূরী জ্ঞাতব্য *(জানুয়ারী'২৫) -ডা. মহিদুল হাসান মা'রূফ*।

স্বাস্থ্যকথা : **১.** (ক) খাওয়ার পর মাত্র ১০ মিনিট হাঁটলেই যে সুফল পাবেন (খ) ফাস্টফুড কেন খাবেন না *(অক্টোবর'২৪)* **২.** চিনি কেন ক্ষতিকর? *(নভেম্বর'২৪)* **৩.** শীতে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয় *(ডিসেম্বর'২৪)* **৪.** লাল চালের পুষ্টিগুণ *(জুলাই'২৫)* **৫.** (ক) হেপাটাইটিস থেকে বাঁচার উপায় (খ) ডায়াবেটিস রোগীর জন্য নিরাপদ ফলমূল *(সেপ্টেম্বর'২৫)*।

পাঠকের মতামত : আত-তাহরীকের প্রতি এক অদম্য ভালোবাসা *(জুন'২৫) -মামুন বিন হাসমত*।

বিশেষ সংবাদ : **১.** মারকায পরিদর্শনে ধর্ম উপদেষ্টা *(অক্টোবর'২৪)* **২.** লেখা শেষে গাছ হবে, এমন কলম বানাল বরগুনার আমীরুল ইসলাম *(মার্চ'২৫)* **৩.** মারকায পরিদর্শনে 'মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড'-এর চেয়ারম্যান *(মে'২৫)* **৪.** মারকায পরিদর্শনে সঊদী আরবের বিশিষ্ট আলেম শায়খ মাহদী বিন আম্মাশ আশ-শাম্মারী *(মে'২৫)* **৫.** মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান-এর আমীর সিনেটর প্রফেসর সাজিদ মীর-এর মৃত্যু *(জুন'২৫)* **৬.** আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ-এর সাবেক সিনিয়র নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর মৃত্যু *(আগস্ট'২৫)*।

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয়-১২টি **২.** দরসে কুরআন-১টি **৩.** দরসে হাদীছ-১টি **৪.** প্রবন্ধ-৪০টি **৫.** প্রচ্ছদ রচনা-২টি **৬.** সাময়িক প্রসঙ্গ-৬টি **৭.** সময়ের ভাবনা-২টি **৮.** দিশারী-৩টি **৯.** ছাহাবী চরিত-২টি **১০.** মনীষী চরিত-১টি **১১.** শিক্ষাঙ্গন-১২টি **১২.** সাহিত্যাঙ্গন-৪ **১৩.** সন্তান পরিচর্যা-৪ **১৪.** ইতিহাস-ঐতিহ্য-৬টি **১৫.** মহিলা অঙ্গন-৬টি **১৬.** নবীনদের পাতা-১টি **১৭.** ভ্রমণস্মৃতি-১টি **১৮.** অমর বাণী-৩টি **১৯.** করণীয়-বর্জনীয়-১টি **২০.** হাদীছের গল্প-৪টি **২১.** গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান-৫টি **২২.** চিকিৎসা জগৎ-১টি **২৩.** স্বাস্থ্যকথা-৭টি **২৪.** পাঠকের মতামত-১টি **২৫.** কবিতা-৫৩টি **২৬.** বিশেষ সংবাদ-৬টি **২৭.** প্রশ্নোত্তর-৪৮০টি। স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

বর্ষশেষের নিবেদন : ২৮তম বর্ষ শেষে আমরা আমাদের সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, এজেন্ট ও গ্রাহক, বিজ্ঞাপন দাতা এবং দেশী ও প্রবাসী সকল শুভানুধ্যায়ীকে আন্তরিক মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আল্লাহ তাঁর দ্বীনদার বান্দাদের হৃদয় সমূহকে এ মহান আন্দোলনের প্রতি রুজু করে দিন- আমীন! *[সম্পাদক]*

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০২৫ (ঢাকার জন্য)

খ্রিষ্টাব্দ	হিজরী	বঙ্গাব্দ	বার	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০১ সেপ্টেম্বর	০৮ রবীঃ আউঃ	১৭ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৩	০৫:৪০	১১:৫৮	০৩:২৬	০৬:১৭	০৭:৩৪
০৩ সেপ্টেম্বর	১০ রবীঃ আউঃ	১৯ ভাদ্র	বুধবার	০৪:২৪	০৫:৪১	১১:৫৮	০৩:২৫	০৬:১৫	০৭:৩১
০৫ সেপ্টেম্বর	১২ রবীঃ আউঃ	২১ ভাদ	শুক্রবার	০৪:২৫	০৫:৪২	১১:৫৭	০৩:২৫	০৬:১৩	০৭:২৯
০৭ সেপ্টেম্বর	১৪ রবীঃ আউঃ	২৩ ভাদ্র	রবিবার	০৪:২৬	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৪	০৬:১১	০৭:২৭
০৯ সেপ্টেম্বর	১৬ রবীঃ আউঃ	২৫ ভাদ্র	মঙ্গলবার	০৪:২৭	০৫:৪২	১১:৫৬	০৩:২৩	০৬:০৯	০৭:২৫
১১ সেপ্টেম্বর	১৮ রবীঃ আউঃ	২৭ ভাদ্র	বৃহস্পতি	০৪:২৭	০৫:৪৪	১১:৫৫	০৩:২২	০৬:০৭	০৭:২২
১৩ সেপ্টেম্বর	২০ রবীঃ আউঃ	২৯ ভাদ্র	শনিবার	০৪:২৮	০৫:৪৪	১১:৫৪	০৩:২১	০৬:০৫	০৭:২০
১৫ সেপ্টেম্বর	২২ রবীঃ আউঃ	৩১ ভাদ্র	সোমবার	০৪:২৯	০৫:৪৫	১১:৫৩	০৩:২০	০৬:০৩	০৭:১৮
১৭ সেপ্টেম্বর	২৪ রবীঃ আউঃ	০২ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩০	০৫:৪৬	১১:৫৩	০৩:১৯	০৬:০১	০৭:১৬
১৯ সেপ্টেম্বর	২৬ রবীঃ আউঃ	০৪ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩১	০৫:৪৭	১১:৫২	০৩:১৮	০৫:৫৮	০৭:১৩
২১ সেপ্টেম্বর	২৮ রবীঃ আউঃ	০৬ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩১	০৫:৪৮	১১:৫১	০৩:১৭	০৫:৫৬	০৭:১১
২৩ সেপ্টেম্বর	৩০ রবীঃ আউঃ	০৮ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩২	০৫:৪৮	১১:৫১	০৩:১৬	০৫:৫৪	০৭:০৯
২৫ সেপ্টেম্বর	০২ রবীঃ আখের	১০ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৩	০৫:৪৯	১১:৫০	০৩:১৫	০৫:৫৩	০৭:০৭
২৭ সেপ্টেম্বর	০৪ রবীঃ আখের	১২ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৪	০৫:৪৯	১১:৪৯	০৩:১৪	০৫:৫০	০৭:০৫
২৯ সেপ্টেম্বর	০৬ রবীঃ আখের	১৪ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৩৪	০৫:৫০	১১:৪৯	০৩:১৩	০৫:৪৮	০৭:০৩
০১ অক্টোবর	০৮ রবীঃ আখের	১৬ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৩৫	০৫:৫১	১১:৪৮	০৩:১২	০৫:৪৬	০৭:০১
০৩ অক্টোবর	১০ রবীঃ আখের	১৮ আশ্বিন	শুক্রবার	০৪:৩৬	০৫:৫১	১১:৪৭	০৩:১১	০৫:৪৪	০৬:৫৯
০৫ অক্টোবর	১২ রবীঃ আখের	২০ আশ্বিন	রবিবার	০৪:৩৭	০৫:৫২	১১:৪৭	০৩:০৯	০৫:৪২	০৬:৫৭
০৭ অক্টোবর	১৪ রবীঃ আখের	২২ আশ্বিন	মঙ্গলবার	০৪:৩৭	০৫:৫৩	১১:৪৬	০৩:০৮	০৫:৪০	০৬:৫৫
০৯ অক্টোবর	১৬ রবীঃ আখের	২৪ আশ্বিন	বৃহস্পতি	০৪:৩৮	০৫:৫৪	১১:৪৬	০৩:০৭	০৫:৩৮	০৬:৫৩
১১ অক্টোবর	১৮ রবীঃ আখের	২৬ আশ্বিন	শনিবার	০৪:৩৯	০৫:৫৫	১১:৪৫	০৩:০৬	০৫:৩৬	০৬:৫১
১৩ অক্টোবর	২০ রবীঃ আখের	২৮ আশ্বিন	সোমবার	০৪:৪০	০৫:৫৬	১১:৪৫	০৩:০৫	০৫:৩৪	০৬:৪৯
১৫ অক্টোবর	২২ রবীঃ আখের	৩০ আশ্বিন	বুধবার	০৪:৪০	০৫:৫৭	১১:৪৪	০৩:০৪	০৫:৩২	০৬:৪৮

যেলা ভিত্তিক সময়সূচী [ঢাকার আগে (-) ও পরে (+)]

আরবী তারিখ চন্দ্র উদয়ের উপর নির্ভরশীল

ঢাকা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
নরসিংদী	−১	−১	−১	−১	−১
গাযীপুর	০	+১	+১	০	০
শরীয়তপুর	+১	+১	০	০	০
নারায়ণগঞ্জ	০	০	০	০	−১
টাঙ্গাইল	+২	+২	+৩	+২	+২
কিশোরগঞ্জ	−২	−১	−১	−১	−১
মানিকগঞ্জ	+২	+২	+২	+২	+২
মুন্সিগঞ্জ	০	০	০	−১	−১
রাজবাড়ী	+৩	+৪	+৩	+৪	+৩
মাদারীপুর	+২	+১	+১	+১	০
গোপালগঞ্জ	+৩	+৩	+২	+২	+১
ফরিদপুর	+৩	+৩	+৩	+২	+২

ময়মনসিংহ বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
শেরপুর	+১	+২	+৩	+২	+৩
ময়মনসিংহ	−১	০	+১	০	+১
জামালপুর	+১	+২	+৩	+২	+৩
নেত্রকোণা	−২	−১	০	−১	০

খুলনা বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
যশোর	+৫	+৫	+৫	+৫	+৪
সাতক্ষীরা	+৬	+৬	+৫	+৫	+৪
মেহেরপুর	+৭	+৮	+৮	+৭	+৭
নড়াইল	+৪	+৪	+৪	+৩	+৩
চুয়াডাঙ্গা	+৭	+৭	+৭	+৬	+৬
কুষ্টিয়া	+৫	+৬	+৬	+৫	+৫
মাগুরা	+৪	+৪	+৪	+৪	+৪
খুলনা	+৪	+৪	+৩	+৩	+২
বাগেরহাট	+৪	+৩	+২	+২	+১
ঝিনাইদহ	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫

বরিশাল বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
ঝালকাঠি	+২	+১	০	+১	০
পটুয়াখালী	+২	+১	০	০	−১
পিরোজপুর	+৩	+২	+১	+১	+১
বরিশাল	+১	+১	০	০	−১
ভোলা	০	০	−১	−১	−২
বরগুনা	+৩	+২	০	+১	০

রাজশাহী বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিরাজগঞ্জ	+২	+৩	+৪	+৩	+৩
পাবনা	+৫	+৫	+৫	+৫	+৫
বগুড়া	+৩	+৫	+৫	+৫	+৫
রাজশাহী	+৭	+৮	+৮	+৭	+৮
নাটোর	+৫	+৬	+৭	+৬	+৬
জয়পুরহাট	+৪	+৬	+৭	+৬	+৭
চাঁপাইনবাবগঞ্জ	+৮	+৯	+৯	+৯	+৯
নওগা	+৫	+৬	+৭	+৬	+৭

রংপুর বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
পঞ্চগড়	+৫	+৮	+৯	+৮	+১০
দিনাজপুর	+৫	+৮	+৯	+৮	+৯
লালমণিরহাট	+২	+৪	+৫	+৫	+৬
নীলফামারী	+৪	+৭	+৮	+৭	+৮
গাইবান্ধা	+২	+৪	+৫	+৪	+৫
ঠাকুরগাঁও	+৬	+৮	+৯	+৯	+১০
রংপুর	+৩	+৫	+৬	+৫	+৬
কুড়িগ্রাম	+১	+৪	+৫	+৪	+৫

চট্টগ্রাম বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
কুমিল্লা	−৩	−৩	−৩	−৩	−৪
ফেনী	−৩	−৩	−৪	−৪	−৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	−৩	−২	−২	−৩	−৩
রাঙ্গামাটি	−৬	−৭	−৭	−৭	−৮
নোয়াখালী	−২	−২	−৩	−৩	−৪
চাঁদপুর	০	−১	−১	−১	−২
লক্ষ্মীপুর	−১	−১	−২	−২	−৩
চট্টগ্রাম	−৪	−৫	−৬	−৬	−৭
কক্সবাজার	−৪	−৬	−৭	−৭	−৮
খাগড়াছড়ি	−৬	−৬	−৬	−৭	−৭
বান্দরবান	−৬	−৭	−৮	−৮	−৯

সিলেট বিভাগ

যেলার নাম	ফজর	যোহর	আছর	মাগরিব	এশা
সিলেট	−৭	−৫	−৫	−৫	−৫
মৌলভীবাযার	−৬	−৫	−৫	−৫	−৫
হবিগঞ্জ	−৪	−৪	−৩	−৪	−৪
সুনামগঞ্জ	−৫	−৩	−৩	−৩	−৩

সূত্র: বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi.

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত গুরুত্বপূর্ণ দু'টি বই

লেখক : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

দরসে হাদীছ সিরিজ -১

▪ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৪৮ ▪ মূল্য : ৩০০

দরসে কুরআন
সিরিজ -১

▪ পৃষ্ঠা সংখ্যা : ৪৬৪ ▪ মূল্য : ৩১০

অর্ডার করুন

০১৭৭০-৮০০৯০০

www.hadeethfoundationbd.com

Reg. No. Raj-164, Monthly At-Tahreek, Vol. 28, Issue 12, September 2025

সদ্য প্রকাশিত বই সমূহ

পাপমুক্ত জীবন
পথ ও পাথেয়

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

তাওফীক্ব
লাভের উপায়

আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ

আদম
আলাইহিস সালাম

আমাদের কোমলমতি শিশুরা নবীগণের জীবনী পাঠ করে শৈশব থেকেই যেন তাঁদের আদর্শকে নিজেদের জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে পারে সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' থেকে রচনা করা হয়েছে **ছোটদের নবী কাহিনী সিরিজ**-এর প্রথম বই **আদম (আ.)**। এ সিরিজের বইগুলোতে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে নবী-রাসূলগণের পরিচয় ও জীবনের নানা ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তাকারে আকর্ষণীয় ছাপা, রঙিন ছবি এবং সহজবোধ্য ভাষায় শিশুদের উপযোগী করে তুলে ধরা হয়েছে।

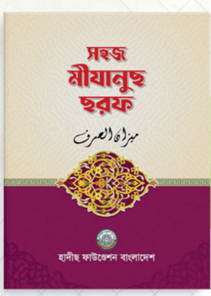

মীযানুছ ছরফ
চতুর্থ শ্রেণীতে পাঠযোগ্য প্রাথমিক ছরফের বই

তামরীনুছ ছরফ
পঞ্চম শ্রেণীতে পাঠযোগ্য মাধ্যমিক ছরফের বই

তাকমীলুছ ছরফ
ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঞ্জেগাঞ্জের স্থলে পাঠযোগ্য

আমীনুন নাহু
ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠযোগ্য নাহুর বই

আরবী ভাষা শুদ্ধরূপে না জানলে ইসলামী জ্ঞানার্জন কখনোই পূর্ণতা পায় না। আর বিশুদ্ধ আরবী শেখা কেবল ব্যাকরণ পূর্ণাঙ্গভাবে আয়ত্ত্ব করার মাধ্যমেই সম্ভব। তাই নাহু-ছরফের সহজবোধ্য ও যুগোপযোগী বই এখন প্রতিটি মাদ্রাসার মৌলিক চাহিদার শীর্ষে। সেই প্রয়োজনকে সামনে রেখে **'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'** নিয়ে এসেছে মাদ্রাসা শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের উপযোগী নাহু ও ছরফের এক ব্যতিক্রমধর্মী সংকলন। যা ধাপে ধাপে সাজানো, সহজবোধ্য ও পরীক্ষিত পদ্ধতিতে রচিত। এই বইগুলো পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নাহু-ছরফে হয়ে উঠবে আরো সমৃদ্ধ, আরো দক্ষ।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া (আম চত্বর), রাজশাহী। মোবাইল : ০১৮৩৫-৪২৩৪১০।

অর্ডার করুন ০১৭৭০-৮০০৯০০